একক ৯ ❑ মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

৯.০ প্রস্তাবনা
৯.১ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতন

৯.০ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল ও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এবং ১৮০৩ সালে দিল্লী ইংরেজ সেনাবাহিনীর দখলে যায় এবং মোঘল বাদশা কেবলমাত্র বিদেশী শক্তি(র একজন পেনশন ভোগী হয়ে দাঁড়ান। এই পর্যায় থেকে আমরা এই বিশাল সাম্রাজ্যের অব(য়ের কারণগুলি জানতে পারি, যার পর্যালোচনা খুবই শি(ামূলক। এছাড়াও আঞ্চলিক শক্তি(র উদয়, মারাঠাদের স্বরাজ্য স্থাপন, ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপরও নজর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

৯.১ মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতন—ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীগণ ও অভিজাত বর্গ

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে সমসাময়িক অন্য সাম্রাজ্যগুলির ঈর্ষা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল ও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে শেষদিকের মোঘল বাদশারা তাঁদের (মতা ও গৌরব হারাল এবং তাঁদের সাম্রাজ্য দিল্লীর আশেপাশে কয়েক বর্গ মাইলে সীমাবদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮০৩ সালে দিল্লী ইংরাজ সেনাবাহিনীর দখলে যায় এবং গর্বিত বাদশা কেবলমাত্র বিদেশী শক্তি(র একজন পেনশনভোগী হয়ে দাঁড়ান। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অব(য়ের কারণগুলি পর্যালোচনা খুবই শি(ামূলক। মধ্যযুগীয় ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক গঠনের ত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলি এই পর্যালোচনায় প্রকাশ পায়। এই দুর্বলতাগুলিই পরবর্তী সময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা এই সাম্রাজ্যের পদানত হওয়ার কারণ।

ঔরাঙ্গজেবের শক্তি(শালী শাসনকালেই সাম্রাজ্যের সংহতি ও স্থায়িত্বের ভিত নড়ে যায়। ঔরঙ্গজেবের অনেক (তিকারক নীতি সত্ত্বেও ১৭০৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মুঘল প্রশাসন ছিল দ(ও সৈন্যবাহিনী ছিল শক্তি(শালী। তখনও মুঘল বংশধরেরা দেশে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পেত।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র সিংহাসনের অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই শু(করে। শেষ পর্যন্ত ৬৫ বছরের বৃদ্ধ বাহাদুর শা (মতা দখল করে।

বাহাদুর শা এক শি(িত, মর্যাদাপূর্ণ এবং যোগ্য লোক ছিলেন। তিনি আপস এবং সৌহাদ্যের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ঔরাঙ্গজেবের সংকীর্ণমনা কিছু নীতির তিনি পরিবর্তন ঘটান এবং হিন্দু রাজা ও অমাত্যদের প্রতি সহনশীল মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে কোনও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করা হয় নি। তাঁর রাজত্বের শু(তে রাজপুত রাজ্য অম্বর ও মেবারের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে তিনি অম্বরে জয়সিংহের ভাই বিজয় সিংহকে স্থাপন করেন এবং মেবারে অজিত সিংহকে মুঘল বশ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করান। অম্বর ও যোধপুর শহর দুটি মুঘল সৈন্যদ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে কঠিন বাধার সামনে পড়েন এবং ভুল বুঝতে পেরে দ্রুত সমঝোতার চেষ্টা করেন। এই সমঝোতায় তাঁর কোনও মহানুভবতা প্রকাশ পায়না, কারণ তিনি এই পদ(প নিতে বাধ্য হন। তিনি অজিত সিংহ ও জয় সিংহকে রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেও গুজরাট, মালত্তা প্রভৃতি গু(ত্বপূর্ণ রাজ্যগুলিতে তাঁদের নিজস্ব

মনসবদার বা সুবেদার বসানর দাবী অগ্রাহ্য করেন। মারাঠা সর্দারদের প্রতি তাঁর সমঝোতার নীতি ছিল অসম্পূর্ণ। দা(ণাত্যে মারাঠাদের সরদেশমুখী মেনে নিলেও চৌথা না মানায় তিনি তাদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। সাহুকে মারাঠা রাজা হিসাবে তিনি স্বীকার না করায় রাজ্যের অধিকার নিয়ে তারাবাঈ এবং সাহুর মধ্যে লড়াই শু(হয়। ফলে একই সাথে দা(ণাত্যে অরাজকতা দেখা দেয় এবং সাহু এবং মারাঠা সর্দাররা বাদশার উপর অসন্তুষ্ট হয়। মারাঠা সর্দাররা পরস্পরের সাথে এবং মোঘল কর্তৃত্বের বি(দ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার ফলে সেখানে শান্তি ও যথার্থ শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় নি।

গু(গোবিন্দ সিংকে উচ্চ পদমর্যাদা দিয়ে বাহাদুর শা বিদ্রোহী শিখদের সাথে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু গু(গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যুর পর বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে শিখেরা আবার বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরে। বাহাদুর শা শিখদের বিদ্রোহ শক্ত(হাতে দমন করার জন্য নিজের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করে শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা আয়ত্তে এনে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হন। যদিও হিমালয়ের পাদদেশে গু(গোবিন্দ সিং দ্বারা নির্মিত আম্বালার উত্তর-পূর্বে লোহাগড় দুর্গ এবং অন্য গু(ত্বপূর্ণ শিখ ঘাঁটিগুলি দখলে বাহাদুর শা সফল হয়েছিলেন, তথাপি শিখদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে তিনি ব্যর্থ হন। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে লোহাগড় দুর্গ শিখরা পুনরায় দখল করে।

বাহাদুর শা বুন্দেলা প্রধান ছত্রশালের সাথে সমঝোতা করেন। ফলে বুন্দেলা প্রধান তাঁর একজন বি(স্ত সামন্ত হয়ে ওঠেন। একইভাবে জাঠ প্রধান চূড়ামন বাহাদুর শার সামন্ত হয়ে বান্দা বাহাদুরের বি(দ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন।

বাহাদুর শার রাজত্বকালে প্রশাসনের আরও অবনতি হয়। বহু পদোন্নতি ও বেপরোয়া ভাবে জায়গির দেবার ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে ওঠে। তাঁর শাসনকালে রাজকীয় সম্পদ, যা নাকি ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ কোটি টাকা ছিল তা নিঃশেষিত হয়।

বাহাদুর শা তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সময় পেলে হয়ত তিনি সাম্রাজ্যের হাল আবার ফেরাতে পারতেন, কিন্তু ১৭১২ খৃঃ তাঁর মৃত্যু তাঁর সাম্রাজ্যে আবার গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে।

এই সময় সিংহাসন উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। এর আগে (মতা দখলের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র রাজপুত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত এবং তাতে অভিজাতরা যে কোন একজন সিংহাসনের দাবীদারের প(নিত। এখন উচ্চাকাঙ(ী অভিজাতরা নিজেরাই (মতা দখলের জন্য প্রতিযোগী হয়ে ওঠে এবং রাজপুত্রদের দাবার বোড়ে হিসাবে এই কাজে লাগাতে থাকে। বাহাদুর শার মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধে তার এক দুর্বল পুত্র জাহানদার শা (মতা দখল করতে পেরেছিল কারণ তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তি(শালী অভিজাত জুলফিকার খাঁ তার প(নেয়।

জাহানদার শা ছিল দুর্বলচিত্ত, আত্মমর্যাদাহীন, সম্পূর্ণভাবে আমোদপ্রমোদে মত্ত। তার মধ্যে সদাচার, শোভনতা এবং মর্যদার লেশমাত্র ছিল না।

জাহানদার শার রাজত্বকালে বাস্তবিকপ(প্রশাসন তার ওয়াজির জুলফিকার খাঁর হাতে চলে যায়। জুলফিকার খুবই দ(এবং কর্ম(ম ছিলেন। তিনি বি(াস করতেন যে রাজদরবারে তার নিজের অবস্থান শক্ত(এবং রাজত্ব নিরাপদ রাখার জন্য রাজপুত রাজা এবং মারাঠা সর্দার ও হিন্দু দলপতিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। সেইজন্য তিনি দ্রুত ঔরাঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন করেন। ঘৃণিত জিজিয়া কর তুলে নেওয়া হয়। অম্বরের জয় সিংহকে মিরজা রাজা সোয়াই উপাধি দিয়ে মালওয়ার শাসক করা হয়। মেবারের অজিত সিংকে মহারাজা উপাধি দিয়ে গুজরাটের শাসনকর্তা করা হয়। জুলফিকার খাঁ তার সহকারী দাউদ খাঁ দা(ণাত্যে মারাঠা রাজা শাহুর সাথে ১৭১১ খৃঃ যে সমঝোতা করেছিল তা স্বীকার করে নেন। এই সমঝোতার ফলে তিনি মারাঠা রাজাকে সরদেশমুখী এবং চৌথা কর দিতে রাজী হন, তবে এই শর্তে যে কর আদায় করবে মুঘল রাজকর্মচারীরা।

চুড়ামন জাঠ ও ছত্রশাল বুন্দেলার সাথে সমঝোতা করলেও বান্দা এবং শিখদের প্রতি জুলফিকার দমনের নীতি

চালু রাখেন। সাম্রাজ্যের অর্থনীতির উন্নতির জন্য বেপরোয়া খরচ কমানো ও জায়গীর দান বন্ধ করেন। মনসবদারদের তাদের নির্ধারিত সৈন্যসংখ্যা প্রতিপালনে বাধ্য করান। কিন্তু তিনি জমি ইজারা দেওয়ার কুপ্রথা চালু করেন। টডোরমল প্রবর্তিত জমির নির্দ্ধারিত খাজনা আদায়ের পরিবর্তে সরকার একশ্রেণীর মধ্যভোগী লোককে কৃষকের কাছ থেকে খুশীমত খাজনা আদায়ের অধিকার দিয়ে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত টাকা নেবার ব্যবস্থা করে। ফলে কৃষকদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায়। অনেক ঈর্ষান্বিত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি(গোপনে জুলফিকার খাঁয়ের বি(দ্ধে কাজ শু(করেন। আরও উদ্বেগের কারণ এই যে সম্রাট নিজেও তার বি(্বাস এবং সহযোগিতা পুরোপুরি জুলফিকার খাঁকে দেন নি। সম্রাটের কানে তাঁর অসৎ বশংবদরা ত্র(মাগত বিষমন্ত্র দিত। তারা বলত যে জুলফিকার খাঁ এত বেশী (মতাবান এবং উচ্চাকাঙ্খী হয়ে উঠছেন যে সম্রাটকেই উৎখাত করতে পারেন। কাপু(ষ সম্রাট ওয়াজিরকে বরখাস্ত করার সাহস না দেখিয়ে তার বি(দ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সুশাসনের প(এর চেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না।

১৭১৩ খৃঃ আগ্রায় তার ভাইপো ফা(ক শিয়ারের হাতে যুদ্ধে হেরে জাহানদার শার অপশাসনের অবসান হয়।

ফা(ক শিয়ার তার এই জয়ের জন্য আবদুল্লা খাঁ ও হুসেন আলি খাঁ ভাতৃদ্বয়ের কাছে ঋণী ছিলেন। তাই তাদের যথাত্র(মে উজির এবং মীর বক্সী পদ দেওয়া হয়। শীঘ্রই দুই ভাই রাজ্যপরিচালনার (ে ত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ফা(ক শিয়ারের রাজ্যশাসন করার মত (মতা ছিল না। তিনি কাপু(ষ, নিষ্ঠুর এবং বি(্বাসের অযোগ্য ছিলেন এবং নিজের পছন্দের লোক এবং চাটুকারদের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও ফা(ক সিয়ার সৈয়দ ভাইদের হাতে পূর্ণ (মতা দিতে রাজী ছিলেন না, তিনি চাইতেন নিজস্ব (মতা ব্যবহার করতে। উল্টোদিকে সৈয়দ ভাইদের ধারণা ছিল যে রাজ্যশাসন ঠিকভাবে চালাতে হলে, সাম্রাজ্যের পতন রোধ করতে হলে এবং তাদের নিজেদের অবস্থা সুর(ত করতে হলে প্রকৃত (মতা তাদের হাতেই থাকা দরকার। এর ফলে ফা(ক সিয়ার এবং তার 'উজির' ও মীর বক্সির মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদী (মতার লড়াই শু(হল। বছরের পর বছর অকৃতজ্ঞ সম্রাট সৈয়দ ভাইদের উৎখাত করার ষড়যন্ত্রকরে চললেন এবং ত্র(মাগত ব্যর্থ হলেন। অবশেষে ১৭১৯ সালে সৈয়দ ভাইরা তাকে (মতাচ্যুত করে হত্যা করেন। তার জায়গায় পর পর দুজন নবীন যুবরাজকে সিংহাসনে বসান হয় যারা (য়রোগে মারা যান। এই অবস্থায় সৈয়দ ভাইরা ১৮ বছর বয়স্ক মহম্মদ শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বানান। ফা(ক সিয়ারের পরবর্তী তিনজন উত্তরাধিকারীই সৈয়দ ভাইদের হাতের পুতুল ছিলেন। এমনকি তাদের চলাফেরা করার বা লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার অধিকারও ছিল সীমাবদ্ধ। সুতরাং ১৭১৩ সাল থেকে ১৭২০ সালে উৎখাত হবার আগে পর্যন্ত সৈয়দ ভাইদের হাতেই রাষ্ট্রের শাসন(মতা ন্যস্ত ছিল।

সৈয়দ ভাইরা ধর্মীয় সহিষু(তার পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। তারা বি(্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ সুষ্ঠুভাবে শাসন করতে হলে মুসলিম এবং হিন্দু রাজা ও অভিজাতদের একসাথে নিয়ে চলতে হবে। ফা(ক সিয়ার এবং শত্রু অভিজাতদের বি(দ্ধে লড়াইতে তারা রাজপুত, মারাঠা এবং জাঠদের পাশে পেতে চাইল। সৈয়দ ভাইরা ফা(ক সিয়ার (মতায় আসার পরে জিজিয়া কর বিলোপ করেন। একইভাবে বেশ কিছু জায়গায় তারা তীর্থযাত্রার উপর করও রদ করেন। তারা মারওয়াড়ের অজিত সিংহ, অম্বরের জয় সিংহ এবং এরকম আরো বেশ কিছু রাজপুত রাজাকে শাসনব্যবস্থার উচ্চপদ দিয়ে নিজেদের পাশে টেনে নেন। তারা জাঠ গোষ্ঠীপতি চুড়ামনের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হন। তাদের শাসনকালের শেষদিকে তারা সম্রাট শাহুর সঙ্গে এক চুক্তি(করেন যার ফলে শাহু শিবাজীর রাজত্বে স্বরাজ্য এবং দা(ণাত্যের ছয়টি অঞ্চলে 'চৌথ' ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার লাভ করেন। এর বদলে শাহু দা(ণাত্যে ১৫,০০০ অ(্বারোহী সৈন্য দিয়ে সৈয়দ ভাইদের সাহায্য করতে সম্মত হন।

সৈয়দ ভাইরা বিদ্রোহ দমন এবং শাসনব্যবস্থাকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তীব্র চেষ্টা করেন। তারা যে একাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার মূল কারণ হল তাদের ত্র(মাগত রাজনৈতিক শত্রুতা, ঝগড়া এবং ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হতে

হয়েছিল। এই ত্র(মাগত সংঘর্ষ শাসনশ্রেণীর ভিতরে প্রশাসনকে ছিন্নভিন্ন এবং প(াঘাতগ্রস্ত করে তুলেছিল। অরাজকতা এবং অব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বস্তরে। রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল কারণ জমিদার ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা ভূমিরাজস্ব দিতে অস্বীকার করছিল, আধিকারিকরা রাষ্ট্রের আয় আত্মসাৎ করতে লাগল এবং কেন্দ্রীয় আয়ও কমে গেছিল। এর ফলে কর্মচারী এবং সৈনিকদের বেতন ঠিকমত সময়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। ফলস্বরূপ সৈন্যরা অবাধ্য এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

যদিও সৈয়দ ভাইরা সমস্ত অভিজাত ও রাজন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও তাদের সাথে নিয়ে চলার প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন, তবুও নিজাম-উল-মুলক এবং তার বাবার জ্ঞাতিভাই মহম্মদ আমিন খান-এর নেতৃত্বে অভিজাতদের একটি শক্তি(শালী দল সৈয়দ ভাইদের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্র শু(করল। এই দলটি দুই ভাইয়ের ত্র(মবর্ধমান (মতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। ফা(ক সিয়ারের অপসারণ এবং হত্যার ঘটনায় এদের অনেকে ভীত হয়ে পড়ল। সম্রাটকে যদি হত্যা করা যেতে পারে তবে সামান্য অভিজাত ব্যক্তি(র নিরাপত্তা কোথায়? তার উপরে সম্রাটের হত্যার ঘটনা জনগণের মধ্যেও সৈয়দ ভাইদের প্রতি বিতৃষ(ার সৃষ্টি করেছিল। সৈয়দ ভাইদের বি(াসঘাতক হিসাবে ঘৃণা করা হচ্ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বেশ কিছু অভিজাত সৈয়দদের রাজপুত ও মারাঠাদের সঙ্গে মিত্রতা এবং হিন্দুদের প্রতি উদার আচরণ পছন্দ করছিল না। এরা প্রচার করল যে সৈয়দরা মুঘল এবং ইসলাম বিরোধী পথে চলছে। এইভাবে এরা মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে ধর্মান্ধ অংশকে সৈয়দ ভাইদের বি(দ্ধে ে(পিয়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। এদের প্রতি সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌র সমর্থন ছিল কারণ তিনি সৈয়দ ভাইদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত(হতে চাইছিলেন। এরা ১৭২০ সালে কনিষ্ঠ সৈয়দ হুসেন আলি খানকে চত্র(ান্ত করে হত্যা করতে স(ম হল। অন্য ভাই আবদুল্লা খানলড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি আগ্রার কাছে পরাজিত হন। এইভাবে উপর মুঘল সাম্রাজ্যের সৈয়দ ভাইদের আধিপত্যের অবসান হয়, যারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সম্রাট নির্মাতা' (kingmaker) বলে পরিচিত।

মহম্মদ শাহ-এর দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর (১৭১৯-১৭৪৮) রাজত্বকাল ছিল এই সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর শেষ সুযোগ। ১৭০৭-১৭২০ সালের মধ্যবর্তী সময়ের মত ঘনঘন রাজ পরিবর্তন এই সময়ে ঘটেনি। তার রাজত্বকালের শু(র দিকে মুঘল আত্মসম্মান একটি গু(ত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি(ছিল। মুঘল সৈন্যদল এবং বিশেষত গোলন্দাজ বাহিনী তখনও এক বিশাল শক্তি(বলেই ধার্য্য হত। মারাঠারা তখনও দা(িণাত্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং রাজপুতরা মুঘল বংশের প্রতি বি(স্ত ছিল। একজন শক্তি(শালী এবং দুরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক আগামী দুরবস্থা সম্পর্কে সজাগ অভিজাতদের সাথে পেলে হয়তো অবস্থা সামলে দিতে পারতেন। কিন্তু মহম্মদ শাহএর জন্য উপযুক্ত(ব্যক্তি(ছিলেন না। তিনি এক দুর্বলচিত্ত, চপলমতি মানুষ ছিলেন এবং আরাম ও বিলাসব্যসনের প্রতি প্রচন্ড আসক্ত(ছিলেন। তিনি রাজ্যচালনার ব্যাপারগুলি অবহেলা করতেন। নিজাম-উল-মুলক বা এদের মত স(ম উজিরদের পূর্ণ সমর্থন দেবার পরিবর্তে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ চাটুকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজের মন্ত্রীদের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্র করতেন। এমনকি তার পছন্দের সভাসদদের নেওয়া উৎকোচের ভাগও তিনি নিতেন।

সম্রাটের অস্থিরমতিত্ব, সন্দেহপ্রবণতা এবং রাজসভায় ত্র(মাগত বিবাদে বিরক্ত(হয়ে সেই সময়ের সবচেয়ে (মতাশালী অভিজাত নিজাম-উল-মুলক নিজের উচ্চাশা পুরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইনি ১৭২২ সালে উজির হবার পর শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এখন সম্রাট ও সাম্রাজ্যকে অন্যের হাতে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭২৪ সালে তিনি (মতা ত্যাগ করে দ(িণে চলে গেলেন এবং হায়দরাবাদ রাজ্যের পত্তন করলেন। তার প্রস্থান সাম্রাজ্য থেকে আনুগত্য ও সততার বিদায়ের প্রতীক। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভাঙনের এখানেই শু(।

একক ১০ ❑ আঞ্চলিক রাজ্যের উদয় বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ

১০.০ আঞ্চলিক রাজ্যের উদয়, বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ

১০.১ মারাঠা স্বরাজ্য

১০.০ আঞ্চলিক রাজ্যের উদয়(বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ, ১৮ শতকের রাষ্ট্র, গঠনের স্বরূপ, রাজনৈতিক এবং সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি-মারাঠা স্বরাজ।

মুঘল সাম্রাজ্য এবং এর শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি স্বাধীন এবং আধা-স্বাধীন শক্তি(যেমন বাংলা, অবধ, হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং মারাঠা সাম্রাজ্য। এই শক্তি(গুলিই অষ্টাদশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের বি(দ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে কয়েকটির সৃষ্টি হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শাসকদের সায়ত্বশাসন ঘোষণা করার ফলে আর বাকিগুলি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বি(দ্ধে বিদ্রোহের ফল।

এই সমস্ত রাজ্যের শাসকেরা অর্থনৈতিক ও প্রাশসনিক দিক থেকে এক কার্যকর রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। এই রাজ্যগুলি সেইসব নিম্নস্তরের স্থানীয় কর্মচারী ও ছোটখাট জমিদারদের কমবেশী নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল, যারা কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়ে সর্বদাই উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপ(ের সঙ্গে ঝগড়া করত এবং কখনো কখনো (মতা ও পৃষ্ঠপোষকতার স্থানীয় কেন্দ্র গড়ে তুলতেও স(ম হত। এই সমস্ত রাজ্যগুলি সবই ধর্মনিরপে(বা অসাম্প্রদায়িক ছিল, ওদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ল(্য ছিল একইরকম। এই শাসকরা অসামরিক বা সামরিক, কোনরকম নিয়োগের সময়ই ধর্মের ভিত্তিতে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন না, এবং বিদ্রোহীরাও কোন শাসকের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করার সময় তার ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না।

অবশ্য এদের মধ্যে কোন রাজ্যই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মোকাবিলা করতে স(ম হয়নি। জমিদার ও জায়গীরদাররা, যাদের সংখ্যা সবসময়েই বাড়ছিল, ত্র(মহ্রাসমান কৃষি উৎপাদন নিয়ে সর্ব(ণ নিজেদের মধ্যে লড়াই করত। উল্টো দিকে কৃষকের অবস্থা ত্র(মশই আরো শোচনীয় হচ্ছিল। যদিও এই রাজ্যগুলি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে ভেঙে পড়ার হাত থেকে র(া করেছিল এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহ দিত, কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যের প্রাথমিক কাঠামোর উন্নতি ও আধুনিকীকরণের জন্য কিছুই করেনি।

হায়দরাবাদ রাজ্যটি নিজাম উল--মুলক আসফ জাহা ১৭২৪ সালে পত্তন করেন। তিনি ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান অভিজাত ছিলেন। সৈয়দ ভাইদের অপসারণে তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, এর পুরস্কার হিসাবে দা(িণাত্যের শাসনভার তাকে দেওয়া হয়েছিল। ১৭২০ থেকে ১৭২২ সাল পর্যন্ত তিনি দা(িণাত্যের তার শাসনের বিরোধী সমস্ত শক্তি(দমন করে নিজের শাসন সুদৃঢ় করেছিলেন এবং একটি সুসংহত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। ১৭২২ থেকে ১৭২৪ সাল পর্যন্ত তিনি পুরো সাম্রাজ্যের উজির ছিলেন। কিন্তু শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জন্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টায় সম্রাট মহম্মদ শাহ বাধা দেওয়ায় তিনি এই পদের প্রতি দ্রুতই বিরাগ বোধ করতে থাকেন। ফলে তিনি দ(িণাত্যে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে তিনি নিরাপদে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারবেন। এখানেই তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা তিনি খুব শক্ত(হাতে শাসন করেছিলেন। যদিও তিনি কখনই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, তবু কার্যত তিনি স্বাধীন শাসকের মতই চলতেন। তিনি দিল্লীর সঙ্গে কথা না বলেই যুদ্ধ করেছেন, সন্ধি করেছেন, খেতাব প্রদান করেছেন বা জমির অধিকার প্রদান করেছেন। হিন্দুদের প্রতি তার আচরণ ছিল সহনশীল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তার দেওয়ান পুরান চাঁদ

ছিলেন হিন্দু। দা(ণাত্যে এক সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের (মতা সুদৃঢ় করেন। তিনি 'বৃহৎ এবং বিপদজনক জমিদারদের তাঁর আধিপত্য মানতে বাধ্য করেন এবং মারাঠাদের তার রাজ্য থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হন। অর্থ ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত(করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর দিল্লীর মতনই বিঘ্নসৃষ্টিকারী শক্তি(হায়দরাবাদেও সক্রি(য় হয়ে ওঠে।

কর্ণাটক ছিল দা(ণাত্যে একটি মুঘল 'সুবাহ', যা হায়দরাবাদের নিজামের কতৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু নিজাম যেমন প্রকৃতপ(দিল্লীর থেকে স্বাধীন হয়ে গেছিলেন, তেমনই কর্ণাটকের উপশাসক, যাকে কর্ণাটকের নবাব বলা হত, তিনি নিজেকে দা(ণাত্যের শাসকের প্রভাবমুক্ত(করে ফেলেন এবং এই পদটিকে বংশানুক্র(মিক করে তোলেন। এইভাবে নবাব 'সাদুতুল্লা খান' তার ভ্রাতুষ্পুত্র 'দোস্ত আলীকে' নিজের উত্তরাধিকারী বানান উর্দ্ধতন শাসক নিজামের অনুমতি ছাড়াই। পরবর্তীকালে ১৭৪০ সালের পরে নবাব পদের জন্য ক্র(মাগত লড়াই চলায় কর্ণাটকের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং ইউরোপের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ভারতের রাজনীতিতে হস্ত(েপ করার সুযোগ পেয়ে যায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে দুই অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি('মুর্শিদকুলি খান' এবং 'আলিবর্দি খান' বাংলাকে প্রায় স্বাধীন করে ফেলেন। যদিও ১৭১২ সালে মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার শাসক নিযুক্ত(করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপ(১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্তি(র সময় থেকে তিনিই কার্যত বাংলার শাসক। সম্রাটকে নিয়মিত উপঢৌকন পাঠালেও তিনি দ্রুতই কেন্দ্রীয় প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত(করে ফেলেন এবং বাংলাকে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিপদ থেকে র(া করার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করেন। তার শাসনকালে তিনটি প্রধান বিদ্রোহ জন্ম নেয়। প্রথমটি সীতারাম রায়, উদয় নারায়ণ, গুলাম মহম্মদের দ্বারা, এরপর সুজাত খান এবং সবশেষে নাজাত খানের দ্বারা। এদের প্রত্যেককে পরাজিত করে 'মুর্শিদকুলি খান' এদের জমিদারী নিজের প্রিয়পাত্র রামজীবনকে দেন। মুর্শিদকুলি খান ১৭২৭ সালে মারা যান। তার জামাতা সুজা-উদ-দীন ১৭৩৯ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। এই বছরই আলিবর্দী খান সুজা-উদ-দীন এর পুত্র, সরফরাজ খানকে অপসারণ করে হত্যা করেন এবং নিজেকে নবাব ঘোষণা করেন।

এই তিনজন নবাবের শাসনকালে দীর্ঘসময় ধরে বাংলায় শান্তি এবং সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা ছিল যা শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে সাহায্য করেছিল। মুর্শিদকুলি খান শাসন ব্যবস্থায় অপচয় রোধ করেন। এছাড়াও তিনি গরীব চাষীদের কৃষিঋণ (টাকাভি) দেবার ব্যবস্থা করেন যাতে তাদের দুর্দশা লাঘব হয় এবং তারা সময়ে জমির কর দিতে পারে। এইভাবে তিনি বাংলার সরকারের সম্পদ বাড়াতে স(ম হন। কিন্তু কর- ভিত্তিক জমি চাষ কৃষকের উপর বোঝা বাড়িয়ে দেয়। যদিও তিনি সমস্ত আইন-বহির্ভূত কর বন্ধ করে কেবলমাত্র নিয়মমত করই আদায় করতেন। কিন্তু এই কর জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে খুবই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আদায় করা হত। তার সংস্কারের আরেকটি ফল হল বহু পুরোন জমিদারদের সরিয়ে তাদের জায়গায় ভুঁইফোঁড় করচাষীদের বসানো।

মুর্শিদ-কুলি-খান এবং তার পরের নবাবরা হিন্দু ও মুসলিমদের কাজের সমান সুযোগ দিতেন। তারা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক এবং সৈনিক পদগুলিতে বাঙালীদের নিয়োগ করতেন, যাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। কর-চাষীদের বাছাই এর জন্য মুর্শিদ-কুলি-খান স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের অগ্রাধিকার দিতেন, যারা মুখত ছিল হিন্দু। এইভাবে বাংলায় এক নতুন ভু-স্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

তিনজন নবাবই বুঝেছিলেন যে ব্যবসায়ের প্রসারে জনগণ এবং সরকার, উভয়েরই উপকার হয়। সুতরাং ভারতীয় ও বিদেশী, উভয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ যোগানো হত। থানা ও চৌকী স্থাপন করে সড়ক এবং জলপথ চোর-ডাকাতদের হাত থেকে নিরাপদ করা হয়েছিল। সরকারী কর্মচারী দিয়ে ব্যক্তি(গত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। শুল্ক প্রশাসনে দুর্নীতি রোধ করা হয়। সাথে সাথে নবাবরা বিদেশী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্মচারীদের উপর কড়া নজরে রাখতেন যাতে তারা সুযোগের অপব্যবহার না করে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশের আইন মানতে

বাধ্য করা হয়েছিল। অন্যান্য বণিকদের মত ইংরাজ বণিকদেরও একই শুল্ক দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। আলিবর্দি খাঁ ইংরাজ ও ফরাসীদের কোলকাতা এবং চন্দননগরে তাদের কল-কারখানাগুলিকে সুরা(ত করার অনুমতি দেননি। বাংলার নবাবরা অবশ্য একটি বিষয়ে দূরদর্শী ও বিচ(ণ মনোভাবের পরিচয় দেননি। ১৭০৭ সালের পর থেকে দাবী আদায়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সামরিক শক্তি(প্রয়োগ বা তার হুমকি দেবার যে প্রবণতা ল(্য করা যাচ্ছিল, তারা সেটিকে শক্ত(হাতে দমন করেননি। কোম্পানীর হুমকির মোকাবিলা করার (মতা নবাবদের ছিল, কিন্তু তাঁরা বি(্বাস করে চলেছিলেন যে একটা ব্যবসায়ী কোম্পানী সরকারের শক্তি(তে কখনও আঘাত করতে পারবে না। ইংরাজ কোম্পানীটি যে শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ীদের কোম্পানী নয়, বরং তারা সেই সময়ের সবচেয়ে বেশী আগ্রাসী, সম্প্রসারণবাদী ও উপনিবেশবাদীদের প্রতিনিধি ছিল, তা বুঝতে তারা অ(ম হয়েছিলেন। বর্হিবি(্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও তার সাথে যোগাযোগের অভাবে তাদের কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। না হলে তারা জানতেন পশ্চিমের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি আফ্রিকা, দ(ণ-পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকায় কী ধ্বংসলীলাই না চালিয়েছিল। একটি শক্তি(শালী সৈন্যবাহিনী গড়তে অনীহার জন্য বাংলার নবাবদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। যেমন, মুর্শিদকুলি খাঁর বাহিনীতে ছিল, মাত্র দু হাজার অ(্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক সৈন্য। আলিবর্দ্দী খাঁকে অহরহ মারাঠা হামলার মুখোমুখি হতে হত এবং শেষে উড়িষ্যার একটি বড় অংশ তিনি তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৭৫৬-৫৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন আলিবর্দীর উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌল্লার বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, একটি শক্তি(শালী সৈন্যবাহিনীর অভাবই বিদেশীদের জয়ের পথ সুগম করে দেয়। নবাবেরা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ত্র(মবর্ধমান দুর্নীতিও বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমনকী বিচারবিভাগের কর্মচারীরা, অর্থাৎ কাজী ও মুফতিরাও উৎকোচ নিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এইসব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলি সরকারি নিয়ম ও নীতিগুলির ভিতরে ভিতরে (য় ঘটায়।

স্বশাসিত সবস্ব রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সাদাত খান বুরহান-উল-মুলক, যিনি ১৭২২ সালে অবধের প্রশাসক নিযুক্ত(হয়েছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী, উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। তাঁর নিযুক্তি(র সময়ে প্রদেশের সর্বত্র বিদ্রোহী জমিদারেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারা জমির কর দিতে অস্বীকার করে, নিজস্ব ফৌজ তৈরী করে, দুর্গ বানায় এবং সম্রাটের শাসনকে অমান্য করে। সাদাত খাঁকে বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি এই অরাজকতা বন্ধ করে বড় জমিদারদের আয়ত্বে আনতে সফল হন এবং এর ফলে তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। বেশীর ভাগ পরাজিত জমিদারকেই অবশ্য পদচ্যুত করা হয়নি। নিয়মিতভাবে কর (জমি রাজস্ব) দিতে সম্মত হওয়ার পরে তাদের নিজেদের জমিদারিতেই রেখে দেওয়া হয়। এছাড়া, তারা অবশ্য অবাধ্য থেকেই যায়। নবাবের সামরিক শক্তি(একটু দুর্বল হয়ে পড়লেই বা তিনি অন্য কোথাও ব্যস্ত থাকলেই এই জমিদারেরা বিদ্রোহ করে বসত, যার ফলে নবাবের (মতা দুর্বল হয়ে পড়ত। সাদাত খাঁর উত্তরাধিকারী সফদার জঙ্গ পরে লিখে-ছিলেন ঃ 'অবধের জমিদারেরা চোখের পলকে গোলমাল বাধানোর শক্তি(রাখত। দা(ণাত্যের মারাঠাদের থেকে তারা বেশী বিপজ্জনক ছিল।'

১৭২৩ সালে সাদাত খাঁ নতুন রাজস্ব ধার্য করেন। তিনি একটি যুক্তি(যুক্ত(ভূমি রাজস্ব চালু করেন এবং জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে র(া করে সাধারণ কৃষকদের ভাগ্যের অনেক উন্নতি করেন।

বাংলার নবাবদের মত তিনিও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ করতেন না। তাঁর বহু সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিন্দু ছিল। তিনি সমস্ত অবাধ্য জমিদার, প্রধান এবং অভিজাতদের দমন করতেন এবং এই ব্যাপারে কোনরকম ধর্মীয় বৈষম্য করতেন না। তাঁর সৈন্যরা ভাল বেতন, ভাল শি(া পেত এবং ভাল অস্ত্র পেত এবং তাঁর প্রশাসন যথেষ্ট দ(ছিল। ১৭৩৯ সালে তার মৃত্যুর পূর্বে তিনি কার্যত স্বাধীন হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রদেশকে বংশ পরম্পরায় দখলে রাখা যায়, এমন ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁর ভাইপো সাফদার জঙ্গ তাঁর উত্তরাধিকারী হন। ১৭৪৮ সালে একই সাথে তিনি সাম্রাজ্যের ভাজির নিয়োজিত হন এবং এলাহাবাদও তাঁকে দেওয়া হয়।

১৭৫৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে সফদার জঙ্গ অযোধ্যা এবং এলাহাবাদের জনগণকে দীর্ঘকালের জন্য শান্তি এনে দিয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করেছিলেন এবং মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন যাতে তাঁর এলাকা মারাঠা আত্র(মণ থেকে নিস্তার পায়। তিনি রোহিলা এবং বাঙ্গাস পাঠানদের বি(দ্ধে যুদ্ধ চালান। ১৭৫০-৫১ সালে বাঙ্গাস নবাবদের বি(দ্ধে যুদ্ধে প্রতিদিন ২৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে মারাঠা সমর্থন এবং প্রতিদিন ১৫,০০০ হাজার টাকা দিয়ে জাঠ সমর্থন লাভ করেন। পরে তিনি পেশোয়ার সাথে একটি চুক্তি(করেন যার ফলে পেশোয়া আহমদ শা আবদালির বি(দ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যকে সাহায্য করবেন এবং ভারতীয় পাঠান ও রাজপুত রাজাদের বিদ্রোহ থেকে সাম্রাজ্যকে র(া করবেন। পরিবর্তে পেশোয়াকে পঞ্চাশ ল(টাকা, পাঞ্জাব, সিন্ধ এবং উত্তর ভারতের অনেকগুলি জেলার চৌথের অধিকার এবং আজমীর ও আগ্রার প্রশাসক নিযুক্ত(করা হবে। কিন্তু এই চুক্তি(ব্যর্থ হয়, কারণ পেশোয়া সফদার জঙ্গের শত্রুদের দলে চলে যান যারা তাকে অযোধ্যা ও এলাহাবাদের প্রশাসক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সফদার জঙ্গ একটা ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়োগের বিষয়ে নিরপে(তার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজা নবাব রাই নামক একজন হিন্দু তাঁর সরকারের সর্বোচ্চ পদে বসেছিল।

দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং নবাবদের অধীনে অভিজাত সম্প্রদায়ের আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে এক সময় অযোধ্যা রাজদরবারকে কেন্দ্র করে এক স্বতন্ত্র লৌ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। লৌ দীর্ঘকাল ধরে অযোধ্যার একটি গু(ত্বপূর্ণ শহর ছিল এবং ১৭৭৫ সালের পর অযোধ্যার নবাবের রাজধানী হয়। শীঘ্রই লৌ শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর প্রতিদন্দ্বী হয়ে ওঠে। এটি হস্তশিল্পেরও এক গু(ত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সফদার জঙ্গ খুবই উচ্চ ব্যক্তি(গত নৈতিকতা বজায় রেখেছিলেন। সমস্ত জীবন তিনি একই স্ত্রীতে অনুগত ছিলেন। বাস্তবে হায়দ্রাবাদ, বাংলা এবং অযোধ্যা, এই তিনটি স্ব-শাসিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারা, অর্থাৎ নিজাম-উল-মুলুক, মুর্শিদকুলি খাঁ এবং আলিবর্দি খাঁ, সাদাৎ খাঁ এবং সাফদার জং প্রত্যেকেই ব্যক্তি(গত উচ্চ ন্যায়পরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই মিতব্যয়ী ছিলেন ও সরল জীবনযাপন করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত অভিজাতরাই বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন, এই ধারণাকে তাদের জীবনধারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কেবলমাত্র সরকারী এবং রাজনৈতিক কাজকর্মে তাঁরা জালিয়াতি, ষড়যন্ত্র ও বি(াসঘাতকতার আশ্রয় নিতেন।

মুঘল প্রাদেশিক সরকারের রূপান্তরের ফলে বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদে স্বশাসিত রাজ্যের জন্মকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন বলা যায়। তাদের পাশাপাশি, হিন্দুমারাঠা এবং শিখেরা সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের সীমার মধ্যে থেকে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছিল যাতে মোঘলদের অনেক প্রশাসনিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাসে মুঘল শাসনকে সুদৃঢ় করার উদ্দ্যেশ্য থেকেই এই নুতন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি পরিণতি লাভ করেছিল। বাংলার স্বাধীন নবাবদের বংশগত পূর্বসুরী মুর্শিদকুলি খাঁকে এই ধনী প্রদেশের আর্থিক অবস্থার পুনর্গঠনের জন্য সম্রাট ১৭০৪ সালে পাঠান। তিনি বাংলার বড় বড় হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করান এবং মোঘল শাসন সুদৃঢ় করেন। এই কার্যত্র(মের মধ্যে দেওয়ান ও সুবেদার পদ দু'টি পূর্ববর্তী সম্রাট আলাদা আলাদা রাখার চেষ্টা করলেও সেগুলি ধীরে ধীরে এক হয়ে যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা, বিশেষ করে নবাব আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-৫৬) নিজের লোক দিয়ে স্থানীয় অফিসগুলি ভর্তি করা শু(করেন এবং তাদের রাজস্ব অনুদান দিতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে দিল্লীর আওতা থেকে এরা বেরিয়ে যায়। ১৭৩৯ সাল এবং নাদির শার রাজধানী আত্র(মণ পর্যন্ত বাংলার বিশাল রাজস্ব নিয়মিত দিল্লীতে পাঠান হত। এরপর রাজস্ব পাঠানো অনিয়মিত হয়ে ওঠে। সম্রাট প্রায়শই বাংলার শত্রুদের পরামর্শমত চলতেন। দিল্লী বাংলার সুক্ষ্ম সুতীর কাপড়ের ব্যবহার বন্ধ করে

দেওয়ায় ফলে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ হয়, যার ফলে বাংলা থেকে অর্থ পাঠানো কমে যায়। ১৭৪২ ও ১৭৪৪ সালে মারাঠা আত্র(মণের ফলে বাংলা নিজেই আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে।

১৭১২ সালের পর দিল্লীতে গোষ্ঠী সংঘাত এবং সম্রাটের অসহায়তা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রবণতাকে জোরদার করে তোলে। ১৭২০ সালে ভারতে জন্মানো নেতাদের এবং ইরান অথবা মধ্য এশীয় বংশোদ্ভূত (মতাশালী ব্যক্তি(দের মধ্যে দীর্ঘ সংঘাত ঔরঙ্গজেবের পূর্বতন সেনাপতি আসফ্ জাকে (নিজাম-উল-মুল্ক) দা(ি ণাত্যের উঁচু সমতলভূমিতে একটি (মতার কেন্দ্র গড়ে তুলতে উৎসাহিত করেছিল। ১৭৪৮ সালে তার মৃত্যুর সময়ে এই কেন্দ্র একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করে, যা পরবর্তী কালে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের জন্ম দেয়। সাদাত খান (বুরহান-উল-মুল্ক), সম্রাটের উজির হন, এবং একই ভাবে তার রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্রকে ১৭২০ সালে দিল্লী থেকে সরিয়ে নেন যখন তাঁর শত্রুরা দিল্লীর দরবারে প্রাধান্য লাভ করে। বাংলার মতই এই নৃপতিরা সুবেদার ও দিওয়ান পদগুলির সংযুক্তি(ঘটান, যদিও মোঘলরা এইগুলি আলাদা রাখার প(পাতি ছিল। শু(তেই আসফজা এবং সাদাত খাঁ এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে যাতে তাদের বংশধরেরা এই নতুন সংযুক্ত(পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এই পদ(প পরিষ্কার ভাবেই মোঘল ঐতিহ্যর বিরোধী ছিল। ১৭৩৯ এবং ১৭৫৯-৬১ সালে যখন দিল্লী ইরান ও আফগান হানাদারদের হাতে চলে যায় তখন এইসব (মতাশালী অমাত্যেরা নিজেদের (মতা বাড়িয়ে নেয়, যদিও শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাঁরা সম্রাটের দরবারে সাহায্য পাঠাত।

মুঘল প্রাদেশিক সরকারের মূল নীতি ও রূপের পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে। ১৭৪৮ সালে ঘোষিত ইচ্ছাপত্রে আসফ জাহ্ তাঁর উত্তরাধিকারীদের বাদশাকে অধিরাজ বলে মান্য করে শাসকদের শ্রেণীত্র(মকে মেনে চলার পরামর্শ দেন। যেহেতু দা(ি ণাত্য এক সময়ে ছয়টি মুসলিম রাজ্য দ্বারা গঠিত ছিল, "তাই পুরানো রাজপরিবারগুলিকে সঠিকভাবে দেখাশুনা করা উচিত," কিন্তু তাদের কাউকে কোনও সরকারী পদে বসান উচিত নয়। হায়দারাবাদের শাসক মারাঠা জমিদারদের সাথে সমঝোতা করবে' কিন্তু সে ইসলামের প্রাধান্য এবং মর্যাদা র(া করবে এবং কখনই মারাঠাদের সীমা লঙ্ঘন করতে দেবে না।" প্রলোভন এবং যুক্তি(পরামর্শ দ্বারা স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিজের প(আনার পুরানো নীতি বাদশা রাজ্যগুলিতে ভ্রমণের সময় অনুসরণ করবে। কিন্তু সৈন্যদের নিয়মিত ছুটি দেবে যাতে তারা সন্তান উৎপাদন করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ছোট নৃপতিদের কৌশল ও উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী মুঘল প্রশাসকদের থেকে খুব বেশী পৃথক ছিল না। শুধুমাত্র তাদের অধিকার অনেক মজবুত ছিল এবং তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলার (মতা দিলে অনেক কমে গেছিল।

আঞ্চলিক শাসকরা তাদের পূর্ববর্তী মুঘল শাসকদের সমস্যাগুলি উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছিল। বাংলার হিন্দু ভুস্বামীরা অনেক বেশী শান্তিপ্রিয় ছিল এবং অর্থনীতি ও ব্যবসা অনেক উন্নত থাকায়, নবাব এবং পরবর্তী সময়ের ইংরাজরা নিয়মিত রাজস্ব ও নিয়ন্ত্রণ আশা করেছিল। কিন্তু অযোধ্যার চিত্রটা ছিল মিশ্র। দা(ণভাবে স্বাধীনচেতা রাজপুত ভুস্বামীদের সাদাত খান দমন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তি(র সাময়িক নজর সরলেই তারা আবার দ্রুত নিজেদের (মতা জাহির করত। দা(ি ণাত্যে এবং কর্ণাটকে নতুন মুঘল শাসন হঠাৎ হঠাৎ সতেজ হয়ে উঠত এবং তা হত নানা বিপরীতধর্মী স্থানীয় তেলেগু ও মারাঠা সর্দারদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে। হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের নবাবেরা অবশ্য যথাত্র(মে দা(ি ণাত্যের এবং বিজয়নগরের স্বাধীন কতৃত্বের স্মৃতি অনন্ত কিছুটা ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

এই সমস্ত পরিবর্তিত প্রাদেশিক কর্তৃত্ব মোঘল অভিজাতদের কাছে যদি তারা কুশলী ও অব্যবসায়ী হত তাহলে ওই এলাকায় তাদের (মতা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। দা(ি ণাত্যে ও সাম্রাজ্যের অন্য অংশে মুঘল সামরিক কর্তাদের রাজস্বের নির্দিষ্ট ভাগ ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ত্র(মাগত পরিবর্তন করা হত, যাতে এই অধিকার বংশানুত্র(মিক না হয়ে দাড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে হায়দারাবাদের কিছু অংশে এই ধরনের অধিকার বংশানুত্র(মিক হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা এক অধিকতর স্থায়ী ভুস্বামী

শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল, যারা তাদের রাজস্ব ও সামরিক কর্তব্য হায়দারাবাদে অবস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় ঠিক করত। অযোধ্যা এবং বাংলায় নতুন শাসকদের পরিবারবর্গ বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিকার এবং রাজস্বের বিনিময়ে তা চাষ করার অধিকার অর্জন করেছিল, যা কালক্রমে বংশানুক্রমিক অধিকার হয়ে ওঠে (বাংলায় জমিদারী, অযোধ্যা ও হায়দারাবাদে তালুকদারী)। স্থানীয় সমাজে মিত্রের খোঁজে প্রাদেশিক শাসকরা স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দাদের মুঘল শাসনের শেষদিকে অর্জিত জমিগুলিকে বিনা রাজস্বে ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং পরে পূর্ণ মালিকানার অধিকার দেয়। এইভাবে তারা দেশীয় (প্রধানত হিন্দু) গোষ্ঠীর (মতা সীমায়িত রাখার আশা করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় মুঘলদের অনেক অনেক পূর্বতন কর্মচারীদের পরিবার গ্রামীণ সম্পদের উপর নিবিড় অধিকার কায়েম করে স্থানীয় শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। আবারও সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তার সফল্যই সাম্রাজ্যের কাঠামো ধ্বংস করায় সাহায্য করেছিল।

একইভাবে, রূপান্তরিত মুঘল প্রদেশগুলিতে রাজস্ব ও ব্যবসায়ে উদ্যোগীরা যাতে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে, তার এক পটভূমির সৃষ্টি হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হায়দারাবাদ, অযোধ্যা, বাংলা এমনকি বিপন্ন দিল্লীর প্রশাসনও মোঘলদের সামরিক রীতিনীতি ও বেতনহার বজায় রাখার চেষ্টা করে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র পদ্ধতি এবং সামরিক উপদেষ্টার ব্যবহার বেড়ে ওঠে। এসব কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ী মহাজন অথবা মুসলমান রাজস্বকৃষক (revenue farmer), যারা অর্থের যোগান দিতে পারত তারা ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। জগত শেঠের মত হিন্দু মহাজনেরা বাংলার রাজনীতিতে প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠে। বেনারসের রাজস্ব বিষয়ে আগরওয়াল মহাজনেরা শেষ কথা বলত। এমনকি মারাঠা রাজ্যগুলিতেও মহাজনি প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় রাজনীতির মুখ্য কুশীলব হয়ে ওঠে।

সমস্ত ভারতবর্ষে মুঘল প্রশাসনিক ছাঁচের প্রভাব ছিল। কিন্তু এই সব আধা স্বায়ত্বশাসিত আঞ্চলিক রাজ্যগুলির সীমাবর্তি বা এই প্রদেশগুলির অভ্যন্তরেই অনেক ছোট রাজ্য ছিল যারা নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করত। মুসলমান শাসনের ইতিহাস লেখকদের মতে, ভারতে সবথেকে নীচ দ্বীপের শাসকেরা অনেক ক্ষেত্রেই ইতর শ্রেণীর গ্রাম্য জমির মালিক বা অবাধ্য গোষ্ঠীপতি ছিল। যাই হোক, তারা প্রায়শই ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার হিন্দু শাসন প্রণালীর অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধি, যাদের অবলম্বন ছিল কর্তৃত্বশালী জমির মালিকগোষ্ঠীদের (মতা ও মূল্যবোধ, যারা এক সময়ে উপরতলার বিশেষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই দেশ শাসন করেছিল। তারা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই কারণে যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিটি তারাই সৃষ্টি করেছিল। এছাড়া এই সব ছোট রাজ্যগুলিকে উৎকোচ দিয়ে এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে ঢুকে ইংরাজরা এই উপমহাদেশে শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল।

এইসব রাজ্যগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে গড়ে উঠেছিল এবং গ্রামীণ (মতাবিন্যাস ও উৎপাদনের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে জড়িত ছিল। পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে অযোধ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত এইরকম একটি বিশাল রাজ্যসমূহের বন্ধন গড়ে উঠেছিল যা রাজপুতদের অন্যস্থানে যাওয়া ও সম্প্রসারণের জন্য ঘটেছিল। রাজপুতরা হিন্দু যোদ্ধা সম্প্রদায়ের আদিরূপ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে এরা তেমন সংগঠিত ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ দ্বারা রক্ষিত রাজপুতদের মধ্যে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ এবং জীবনধারায় বিশুদ্ধতা রক্ষার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে এক গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক রাজপুতই ভ্রাম্যমান পেশাদার সৈন্য সম্প্রদায়ের ছিল যারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু রমণীদের এমনকী মুসলমান মহিলা বিয়ে করে নিজেদের অনুগামীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে রাজস্থানে সমবেতভাবে বেশ কিছু রাজ্য বংশানুক্রমিক টিকে ছিল মুঘলদের সাথে বিরোধ করে বা তাদের অনুগত হয়ে। এইগুলি অবশ্যই কেন্দ্রীভূত বা আঞ্চলিক রাজ্য ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী শাসকরা প্রায়শই একে অপরের রাজত্বে রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু পৃথকভাবে একটি রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা মুসলমান সৈন্যবাহিনীর (মতা এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহসুত্রে আবদ্ধ থাকার কারণে সীমিত ছিল।

দা(ণাত্যে এবং সুদূর দ(ণে বহুপু(ষ ধরে তেলেগুভাষী যোদ্ধাশ্রেণী রাজপুতদের ভূমিকা পালন করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার সব একীকরণ করে দেবার প্রবণতা এদের স্পর্শ করেনি। এইসব অধিপতিরা তি(পতি এবং মাদুরাইএর মত বৃহৎ মন্দিরগুলি রচনা করত। তারা বৈষ(ব সম্প্রদায়ের নেতাদের শ্রদ্ধা করত, যারা পরবর্তী সময়ে তাদের ধর্মীয় গু(হয়ে ওঠে। এইভাবে তারা দ(ণের প্রাচীন সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যায়। বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত দ(ণ অঞ্চলে এক শিথিল নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল এবং রাজ্য পরিচালনা, পূজা পদ্ধতি এবং ধর্মীয় শিল্পকলার এক বিশেষ শৈলীর জন্ম দিয়েছিল। মাদুরাই ও মহীশূরের নৃপতিরা এই শৈলীকে অনুসরণ করে চলতেন। কাল্লার বা মারাভা উপজাতির জঙ্গী নেতাদের উপর অবশ্য হিন্দু ধর্ম অতটা প্রভাব ফেলতে পারেনি, এবং তারাই তাদের তথাকথিত প্রভুদের হয়ে গ্রামের সুর(া ও খাজনা আদায় করায় (মতা কোন একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হয়ে বি(প্ত হয়ে পড়েছিল।

পুরানো পদ্ধতির অবশিষ্ট রূপান্তরিত হিন্দু রাজ্যগুলির পাশাপাশি যোদ্ধা অথবা খাজনা আদায়কারী চালনা উদ্যোগী দ্বারা হালফিল প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ছিল। আফগান ভারাটে সৈনিকরা তাদের সামরিক শিবিরের চর্তুদিকে সারা ভারতে সুসংবদ্ধ সুলতানী গড়ে তোলে। এর কিছু ১৬৮০ দশকে মোঘল শাসনের পূর্বে, কিছু মোঘলদের সামন্ত হিসাবে এবং আরও কিছু ১৭০৭ সালের পরে বাদশার তাদের (মতা রাখার চেষ্টা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আফগান সুলতানীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লীর কাছে রোহিলা রাজ্য, মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্য ভুপাল ও মান্ডু, দ(ণের জিঞ্জী নেলোর। এই ধরনের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক সামরিক শক্তি(র তাদের আঞ্চলিক রাজার এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের মত অর্থ পরিচালনায় দ(তা এবং ধনী লোকদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যাতে রাজাকে প্রাথমিক রাজস্ব দেওয়া যায়। সুতরাং কিছু প্রভাবশালী ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল যার সম্পদশালী যোদ্ধা নেতা রাজার (মতা প্রয়োগ করত। বেনারসের রাজা পুরাতন হিন্দু রাজাদের অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেমন পৃষ্ঠপোষকতা বা পূজা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। অযোধ্যায় মনসারাম যে কারণে প্রথমে রাজস্বের পরিবর্তে চাষ এবং পরে মহারাজা হিসাবে টিকে ছিল (১৭৩৮ সাল থেকে) তা হল বেনারসের হিন্দু মহাজনদের আর্থিক সমর্থন এবং তার গ্রামীণ স্ব-জাতির সামরিক সমর্থন লাভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় কিছু ন(ত্র বিশেষ করে বর্দ্ধমানের বৃহৎ জমিদার মোঘলদের রাজস্ব আদায়ের অধিকার থেকে সৃষ্টি হয়েছিল।

হিন্দু ও মুসলমান প্রভাবের বাইরেও বেশ কিছু স্থানীয় শক্তি(গড়ে উঠেছিল যাদের ভিত্তি ছিল উপত্যকা ও সমতলভূমির উর্বর কৃষির জমি। হিন্দু এবং উপজাতীয় ভারতীয়দের মধ্যে সমতলভূমির কিন্তু গোটা উত্তর, মধ্যভারত এবং পশ্চিমঘাটের অবি(্ববাদীরা মুখ্য সংস্কৃতি এবং ধর্ম দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত ছিল। এই ধরনের কিছু লোকের দলপতি থাকত যাদের বাইরের নৃপতিরা রাজা উপাধি দিত। যদিও প্রায়শই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক যাযাবর বসতি বা শিকারী পরিবার মুখ্য রাজনৈতিক একক ছিল এবং রাষ্ট্রের সত্তার অস্তিত্ব ছিল না।

ছোট রাজার এবং স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তর রকমফের ছিল। কখনও কখনও দ(ণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলের ত্রিবাঙ্কুর বা পূর্ব-উপকূলের মারাঠা তানজোর রাষ্ট্রের শাসকরা চাউল বা অন্য দামী শস্য উৎপাদনের বিষয়ে হস্ত(েপ করত এবং রাজকীয় শস্যগোলা বা একচেটিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে তো নিয়ন্ত্রণ করত।

কিছু কিছু (ে ত্রে শাসকরা রাজার খাসজমির (demense) সম্পদ বাড়ানোর জন্য নিজেদের কিছু কৃষক রাখত। যাইহোক সাধারণ ঝোঁক ছিল কিছু কৃষক রাখত। যাইহোক সাধারণ ঝোঁক ছিল অনেকটা মুঘল ব্যবস্থার মতই অর্থাৎ মুদ্রার মাধ্যমে কর দেওয়া ও কৃষকদের দ্বারা চাষের প্রাধান্য। উদাহরণস্বরূপ ১৬০০ সাল থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে মহীশূরের রাজা ত্র(মাগত কর বৃদ্ধি করেন ১০% থেকে। ১৭৯৫ সালে টিপু সুলতানের অধীনে সেই রাজস্ব বেড়ে দাঁড়ায় ৪০% এর মত। এটা অবশ্য সত্যি যে এই বর্ধিত করের সবটা সবসময় আদায় করা হত না যদিও যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকীয় সাড়ম্বরের জন্য গোটা উপমহাদেশ জুড়ে অর্থের প্রয়োজন বেশী করে দেখা দিতে শু(করেছিল। এই কারণেই স্থানীয় রাজাদের আমলে শি(িত ও অসংখ্য চাকুরীজীবি পরিবার স্থানীয় রাজ্যগুলির কাজকর্মের ব্যাপারে

গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে। কুসীদজীবি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীরা রাজস্বের জামিনদার ও আদালতের অনুমোদনকারীরূপে উদ্ভুত হন।

(দ্র রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব পরিচয়, ধর্মবি(াস ও নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের ধরন বজায় রাখে। তা সত্ত্বেও অন্ততঃ মুঘল ব্যবস্থাপনাই বাহ্যিক রূপটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। ঠিক একইভাবে ব্যাপক সংখ্যক ধরণগুলিকে অনুসরণ করতে উৎসাহ যোগায় বহিরাগত চাকুরীজীবি মানুষের প্রভাবও শাসকশ্রেণীকে বৃহৎ পূজাপদ্ধতি ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার ধরণগুলিকে অণুসরণ করতে উৎসাহ যোগায়। তামিলনাড়ুর মারাবার ও কাল্লারের যোদ্ধা রাজারা নিজেদের হিন্দু রাজায় পরিণত করেন। তারা সুদূর দ(ণের বিপথে মন্দিরগুলি থেকে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করেন। পশ্চিম গাঙ্গেয় সমতলভূমি ও দা(ণাত্যের দ(ণে আফগান শাসকরা তাদের রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে তুললে নতুন ইসলামীয় শি(াকেন্দ্র ও পাঠাগারের স্থাপনা হয়। সুফী অতীন্দ্রিয়বাদীদের নাকশ্‌বন্দী দল নতুন নতুন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যা গড়ে ওঠে তা কোনো গোঁড়া বা কোনো প্রচলিত ধরনের ধর্মীয় অভ্যাস নয়। বরং তা হল বহিরাগত কিছু ধর্মীয় অভ্যাস, স্থানীয় দেবদেবী ও ধর্মীয় সাধকদের মধ্যবর্তী একটি সূক্ষ্ম এবং কখনো কখনো সংঘাতপূর্ণ ব্যবস্থা। এর ফলে একমাত্রিকতাকে অতিত্র(ম করে এক জটিলতর ও সমৃদ্ধতর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকে প্রবণতার সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে কর্তৃত্বের যে টানাপোড়েন তার কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্যাপক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনা সত্ত্বেও বেশী উদ্যোগী যোদ্ধা ও তাদের পুঁজিপতি মক্কেলদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে এসব ঘটনা। জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ধরনের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য দু'টি শর্ত খুবই গু(ত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ গ্রামগুলিতে অন্ততঃ কিছুটা স্থিরতা থাকা বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ কৃষককুল ও তাদের নিয়ন্ত্রক যোদ্ধা শ্রেণীর যোগাযোগ ঘটানোর জন্য এক ধরনের কর্তৃত্বের উপস্থিতি। দ্বিতীয়ত নগদ অর্থ ও পরিষেবার জন্য উচ্চশ্রেণীর সর্ব(ণের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন ও বাণিজ্য। এই অধ্যায় এখন এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করবে।

১০.১ মারাঠা স্বরাজ্য

(য়িষু(মুঘল শক্তি(র প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এসেছিল মারাঠা রাজ্যের কাছ থেকে। এই মারাঠা রাজ্য ছিল পরবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তি(শালী। সত্যি কথা বলতে কি একমাত্র এই রাজ্যটিই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভরিয়ে তুলতে স(ম ছিল। উপরন্তু এই কাজ করার জন্য উপযুক্ত(সেনাধ্য(ও রাজনীতিবিদও তাদের ছিল। কিন্তু মারাঠা সর্দারদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁদের ছিল না। সেই কারণেই তাঁরা মুঘলদের জায়গা নিতে পারেননি। তবু তারা মুঘল সাম্রাজ্যের বি(দ্ধে ত্র(মাগতঃ যুদ্ধ করে তাকে ধ্বংস করে ফেলেছিল।

শিবাজীর নাতি শাহু ১৬৮৯ সাল থেকে ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়ে ছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁকে ও তাঁর মাকে যথেষ্ট বিবেচনা, সম্মান ও মর্যাদা দিয়েই চলতেন। হয়তো শাহুর সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার আশাতেই তিনি তাদের ধর্মীয়, জাতীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনের দিকে ল(্য রাখতেন। ১৭০৭-এ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহু মুক্তি(পান এবং খুব শীঘ্রই সাতারায় শাহু ও কোলাপুরে তারাবাইয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শু(হয়। তারাবাই ১৭০০ সালে তাঁর স্বামী রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর হয়ে মুঘল বিরোধী যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। মারাঠা সর্দাররা, যাদের প্রত্যেকের অনুগত প্রচুর সৈন্য ছিল, তাঁরা (মতার দাবীদার যে কোন প(ের দিকে চলে যেতেন। এদের মধ্যে কয়েকজন দা(ণাত্যে মুঘল শাসকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শাহু ও তাঁর কোলহাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে সংঘাতের সময়ই

শাহুর পেশোয়া বালাজী বি(নাথের অধীনে একটি নতুন মারাঠা সরকারের উদ্ভব হয়। এই পরিবর্তনের সাথেই দ্বিতীয় পর্যায়ের শু(হয়—মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়াদের কর্তৃত্বের সূচনা হয় যার ফলে মারাঠা রাজ্য একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

বালাজী বি(নাথ, একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এক (দ্র রাজস্ব আধিকারিক হিসাবে শু(করে ধাপে ধাপে তিনি এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীতে পরিণত হন। শাহুর শত্রুদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নেন। কূটনীতিতে তিনি দ(ছিলেন এবং অনেক বড় বড় মারাঠা সর্দারকে তিনি শাহুর দিকে টেনে নিয়েছিলেন। ১৭১৩ সালে, শাহু তাকে তাঁর পেশোয়া বা মিত্খ্ প্রধান (মুখ্যমন্ত্রী) নিয়োগ করেন। বালাজী বি(নাথ ধীরে ধীরে মারাঠা সর্দার ও কোলাপুরের দ(ণে যেখানে রাজারামের বংশধররা রাজত্ব করতেন। শুধু সেটুকু ছাড়া পুরো মহারাষ্ট্রেই নিজের ও শাহুর (মতা বৃদ্ধি করেন। এই পেশোয়া নিজের হাতে যাবতীয় (মতা কু(গত করেন এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও সর্দারদের পিছনে ফেলেন দেন। সত্যি কথা বলতে কি, তিনি এবং তাঁর পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশোয়াকেই মারাঠা সাম্রাজ্যের কার্যকরী প্রধান হিসাবে স্থাপন করেন।

বালাজী বি(নাথ মুঘল আধিকারিকদের অর্ন্তদ্বন্দ্বের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মারাঠা শক্তি(বৃদ্ধি করেন। তিনি জুলফীকার খানকে দা(ণাত্যের চৌথ ও সরদেশমুখী দিতে বাধ্য করেন। অবশেষে তিনি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি(করেন। আগে যে সব অঞ্চল শিবাজীর রাজ্য বলে পরিচিত ছিল, তার পুরোটাই শাহুর অধিকারে আসে ও তিনি দা(ণাত্যের ছয়টি প্রদেশ থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়েরও দায়িত্ব পান। বদলে শাহু নামেমাত্র মুঘল কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে সম্রাটের কাছে ১৫০০০ অ(ারোহী সৈন্য পাঠাতে সম্মত হন। এর উদ্দেশ্য ছিল দা(ণাত্যে লুঠ ও বিদ্রোহ বন্ধ করা তিনি বার্ষিক দশ লাখ টাকা রাজকর দিতেও রাজী হন। ১৭১৯ এ এক মারাঠি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বালাজী বি(নাথ সৈয়দ হুসেন আলিখানকে সঙ্গে নিয়ে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফা(ক শিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করতে সাহায্য করেন। দিল্লীতে এই প্রথম তাঁরা নিজের চোখে সাম্রাজ্যের দুর্বলতাগুলি প্রত্য(করেন এবং এর ফলে তাঁদের উত্তরে সাম্রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

দা(ণাত্যে চৌথ ও সরদেশমুখীর সুষ্ঠভাবে আদায়ের জন্য বালাজী বি(নাথ মারাঠা সর্দারদের আলাদা অঞ্চল ভাগ করে দিয়েছিলেন। এরা অবশ্য আদায়ীকৃত রাজস্বের বেশীরভাগ নিজের কাছেই রাখতেন। চৌথ ও সরদেশমুখীর এই ব্যবস্থা পেশোয়াকে পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা নিজের (মতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। একগুচ্ছ উচ্চাকাঙ্খী সর্দারও তাঁর দিকে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মারাঠা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য এই ব্যবস্থাকে এক প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। ওয়াতন, সরঞ্জাম (জাগির) ইত্যাদি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই মারাঠা সর্দারদের শক্তি(মান, স্বৈরাচারী ও কেন্দ্রীয় (মতার প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রান্তগুলি তারা নিয়ন্ত্রন করতে শু(করে এবং ধীরে ধীরে সেইসব জায়গার স্বশাসিত শধান হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের মূল রাজ্যের বাইরে মারাঠারা যখনই কোনো যুদ্ধজয় করেছে, তখন কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনী মারাঠা রাজা বা পেশোয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং মারাঠা সর্দাররাও তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছে। এই যুদ্ধজয়ের পদ্ধতিতে সর্দাররা প্রায়ই একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। এই সময়ে রাজা যদি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতেন, তবে তারা মুঘল বা ব্রিটিশ কা(র সঙ্গেই হাত মেলাতে ইতঃস্তত করতেন না।

বালাজী বি(নাথ মারা যান ১৭২০ সালে। তার ২০ বছর বয়স্ক ছেলে বাজী রাও তাঁর উত্তরাধিকারী হন। সাহসী ও কুশলী সেনাপতি, এই উচ্চাকাঙ্খী ও বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদকে "শিবাজীর পরে গেরিলা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা" বলা হত। বাজী রাওয়ের নেতৃত্বাধীনে মুঘল সাম্রাজ্যের বি(দ্ধে বহু যুদ্ধ চালান হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক অঞ্চলে চৌথ আদায়ের অধিকার হাসিল করা এবং পরে সেসব অঞ্চলকে মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত(করা। বাজী রাওয়ের মৃত্যুর পরে মারাঠারা মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখন্ডের কিছু এলাকার অধিকার পায়। গাইকোয়াড়, হোলকার, ভোঁসলে ইত্যাদি

পরিবার এই সময় গু(ত্ব অর্জন করে।

বাজী রাও সারাজীবনই দা(িণাত্যে নিজাম-উল্-মুল্কের (মতা খর্ব করার কাজ করেন। নিজাম কোলাপুরের রাজা কিছু মারাঠা সর্দার ও মুঘল আধিকারিকদের সহায়তায় বাজী রাওয়ের সঙ্গে দুবার যুদ্ধে লিপ্ত হন ও দুবার নিজাম পরাজিত হন এবং মারাঠাদের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার দিতে বাধ্য হন। ১৭৩৩ সালে বাজী রাও জাঞ্জিরার সিদিদের বি(দ্ধে লড়াই শু(করেন এবং তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করেন। একই সঙ্গে পর্তুগীজদের বি(দ্ধেও যুদ্ধ শু(করেন। পরিশেষে সলসেট দখল করতে স(ম হন। কিন্তু পর্তুগীজরা পশ্চিম উপকূলে অন্যান্য অঞ্চলে তাদের (মতা ধরে রাখে।

১৭৪০-এর এপ্রিল মাসে বাজী রাও মারা যান। মাত্রা ২০ বছরের স্বল্প সময়ে তিনি মহারাষ্ট্রের পটভূমির পরিবর্তন ঘটান। মহারাষ্ট্র একটি রাজ্য থেকে সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য তিনি সাম্রাজ্যকে কোনো শক্ত(জমির ওপর রাখতে পারেননি। নতুন নতুন অঞ্চল সাম্রাজ্যে সংযোজিত হয় এবং তাদের প্রশাসনের দিকেও নজর দেওয়া হয়। সফল সর্দারদের মুখ্য চিন্তার বিষয় ছিল রাজস্ব সংত্র(ান্ত সমস্যাগুলি।

বাজী রাওয়ের ১৮ বছর বয়স্ক পুত্র বালাজী বাজী রাও (নানা সাহেব নামেই সমধিক পরিচিত) ১৭৬১ সালে পেশোয়া হন। তিনি তাঁর পিতার মতই যোগ্য ছিলেন, তবে অতটা কর্মঠ ছিলেন না। ১৭৪৯ সালে শাহুর মৃত্যুর পর পেশোয়ার হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পড়ে। এখন পেশোয়া রাষ্ট্রের সত্যিকারের শাসক হয়ে ওঠেন। এখন তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন। এরই প্রতীক হিসাবে তিনি তাঁর প্রধান কার্যালয় পুণায় স্থানান্তরিত করেন।

বালাজী বাজী রাও তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন ও মারাঠা শক্তি(কে তার শীর্ষে নিয়ে যান। মারাঠা সৈন্য এখন পুরো ভারতকে ছারখার করতে থাকে। মালব, গুজরাট, বুন্দেলখন্ডে তাঁদের (মতা সুসংহত হয়। বারবার বাংলা আত্র(মণ করা হয় ও বাংলার নবাব উড়িষ্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দ(িণে মহীশূর ও অন্যান্য ছোটখাট রাজ্যও তারা লাভ করে। ১৭৬০ সালে হায়দ্রাবাদের নিজাম উদগীরের যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ৬২ ল(টাকা রাজস্ব সম্পন্ন একটি এলাকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। উত্তরে মারাঠারা এখন মুঘল সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ায়। গাঙ্গেয় দোয়াব ও রাজপুতানার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে তারা ইমাদ-উল-মুল্ককে দিল্লীর উজীর হতে সহায়তা করে। উজীর শীগগিরই মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। এবার তারা পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হয় এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর প্রতিনিধিকে অপসারণ করে। এই ঘটনা তাদের আফগানিস্তানের এই যোদ্ধা রাজার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে নিয়ে আসে। তিনি মারাঠা শক্তি(র সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ভারতে আসেন।

উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এক বিশাল সংঘর্ষ দেখা দেয়। আহম্মদ শাহ আব্দালী দ্রুত রোহিলখন্ডের নাজিব-উদ-দৌলা ও অযোধ্যার সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন, কেননা পূর্বেই এরা মারাঠাদের হাতে যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের গু(ত্ব বুঝতে পেরে পেশোয়া তাঁর পুত্রের নেতৃত্বাধীনে উত্তরে কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেন এবং আসল ও বিশাল বাহিনী তাঁর ভাই সদাশিব রাও ভাউয়ের নেতৃত্বে অর্পণ করেন। এই সৈন্যদলের একটি অংশ ছিল ইব্রাহিম খান গর্দির নেতৃত্বে ইওরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনী। মারাঠারা এখন অন্যান্য শক্তি(গুলির সঙ্গে মৈত্রী করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু তাঁদের আগেকার ব্যবহার ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা এই সমস্ত সম্ভাবনাই মুছে দিয়েছিল। তাঁরা রাজপুতানার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেও সেখান থেকে বিশাল পরিমাণ রাজকর ও জরিমানা আদায় করে। অযোধ্যাতেও তারা এক বিশাল অঞ্চল ও আর্থিক দাবী পেশ করে। পাঞ্জাবে তাঁদের কাজকর্ম বিরূপ প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, জাঠ প্রধান, ভারী জরিমানা চাপানোর জন্য জাঠ প্রধানরাও তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। এইসব কারণে কোনো সাহায্য তারা পায়নি। সুতরাং একমাত্র ইমাদ-উল্-মুল্কের দুর্বল সাহায্য নিয়ে তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। মারাঠা সেনাধ্য(রা এর মধ্যেও নিজেদের মধ্যে কলহ জারী রেখেছিলেন।

১৭৬১ সালের ১৪ই জানুয়ারী দুই শক্তি(পানিপথের প্রান্তরে যুদ্ধ শু(করে। মারাঠা সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত

হয় এবং বিশ্বাস রাও, সদাশিব রাও ভাউ ও আরও বহু মারাঠা সেনাধ্য(্য মারা যান এবং প্রায় ২৮,০০০ সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। যারা পালাবার চেষ্টা করে, আফগান বাহিনী তাদের তাড়া করে এবং জাঠ, আহির, গুজর ইত্যাদি উপজাতিরা তাদের ওপর লুঠতরাজ চালায়।

পেশোয়া উত্তরে তাঁর ভাইকে বাঁচানর জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু এই দুঃখের খবর শুনে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ১৭৬১ সালে মারা যান।

পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় তাদের বিপর্যয় ডেকে আনে। তাঁরা তাদের সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশ হারায় ও তাদের মর্যাদা (ু ন্ন হয়। সর্বোপরি তাদের পরাজয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা ও দ(িণ ভারতে সুসংহত হতে সাহায্য করে। আফগানরাও তাদের এই বিজয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। পাঞ্জাবের ওপর তারা তাদের অধিকার হারায়। সত্যিকথা বলতে কি পানিপথের যুদ্ধের ফলে কে শাসক, ও কে শাসক নয় তা নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং ব্রিটিশদের উত্থানের পথ ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়।

১৭৬১-তে ১৭ বছর বয়স্ক মাধব রাও পেশোয়া হন। তিনি একজন প্রতিভাবান যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। মাত্র ১১ বছরের স্বল্প সময়ে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব পুন(দ্ধার করেন। তিনি মহীশূরের হায়দার আলিকে পরাজিত করেন এবং রাজকর দিতে বাধ্য করেন। এমনকী উত্তর ভারতেও (মতা কিছুটা পুন(দ্ধার করেন। রোহেলা এবং রাজপুত রাজ্যগুলিও জাঠ প্রধানদের শায়েস্তা করে ১৭৭১ সালে মারাঠারা শাহ আলমকে ফিরিয়ে আনেন, যিনি এখন তাদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। তাই এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মারাঠাদের উত্থান আবার শু(হয়েছে।

মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে মারাঠা শক্তি(আবার একটি ধাক্কা খায়। পুনায় বালাজী বাজী রাওয়ের ছোট ভাই ও মাধব রাওয়ের ছোট ভাই নারায়ণ রাওয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। ১৭৭৩ সালে নারায়ণ রাও নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ সন্তান সওয়াই মাধব রাও তার উত্তরাধিকারী হন, হতাশায় জর্জরিত হয়ে মাধব রাও ব্রিটিশদের দিকে যোগ দেন ও (মতা অধিকার করতে চান। এরই ফলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পেশোয়ার (মতা এখন পতনের দিকে ঢলে পড়ে।

নানা সাহেবের নেতৃত্বে সওয়াই মাধব রাও ও রঘুনাথ রাওয়ের অনুগতদের মধ্যে চক্র(ান্ত শু(হয়। এর পর থেকেই মারাঠা সর্দাররা উত্তরে অর্ধস্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে থাকেন। এদের মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড, নাগপুরের ভোঁসাল, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ারা ছিলেন প্রধান। মুঘল প্রশাসনের ছাঁদে তারা সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসন গড়ে তুলেছিলেন ও তাঁদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও ছিল। পেশোয়াদের প্রতি তাদের আনুগত্য ত্র(মেই নামেমাত্র হয়ে উঠেছিল। পরিবর্তে পুনায় তাঁরা বিভক্ত(হয়ে পড়েন এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের শত্রুদের সঙ্গে মিলে চক্র(ান্তে লিপ্ত হন।

উত্তরের মারাঠা শাসকদের মধ্যে মহাদজী সিন্ধিয়া ছিলেন সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ। তিনি ফরাসী অফিসারদের সাহায্যে সম্রাট শাহ্ আলমের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। তিনি সম্রাটের কাছ থেকে সম্রাটের প্রতিনিধি (নাইব-ই-মুনাইব) উপাধি পান। অর্থাৎ মহাদজী পেশোয়ার প(থেকে কাজ চালানোর (মতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য মারাঠা রাজাদের বি(দ্ধে চক্র(ান্ত করে নিজের শক্তি(র অপব্যয় করেন। তিনি ইন্দোরের হোলকারের ভীষণ শত্রু ছিলেন। তিনি ১৭৯৪ সালে মারা যান। তিনি এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং নানা ফড়নবীসই ছিলেন শেষ দুই যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনায়ক যাঁরা মারাঠা গৌরবকে এক নতুন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭৯৫ সালে সওয়াই মাধব রাওয়ের মৃত্যু হয়। চূড়ান্ত অপদার্থ দ্বিতীয় বাজী রাও তাঁর উত্তরাধিকারী হন। বৃটিশরা এখন তাদের সর্বোচ্চ (মতালাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা মারাঠাদের চ্যালেঞ্জের অবসান ঘটাতে চায়। কূটনীতির সাহায্যে ব্রিটিশরা পরস্পরবিরোধী মারাঠা সর্দারদের বিভক্ত(করেন এবং দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫) ও তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে তাদের আলাদাভাবে পরাজিত করেন। অন্যান্য মারাঠা রাজ্যগুলিকে অধীনস্থ রাজ্য হিসাবে থাকতে দেওয়া

হয়।

এইভাবে মুঘল সাম্রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ও তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য স্থাপনের মারাঠা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ ছিল এই যে মারাঠা সাম্রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের মতই পতনশীল সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত করত এবং একইধরনের অর্ন্তনিহিত সমস্যার শিকার হয়েছিল। মারাঠা প্রধানরা শেষের দিকের মুঘল অভিজাতবর্গের মতই ছিলেন, ঠিক যেমন সরঞ্জামী ব্যবস্থা মুঘল জাগীর ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। যতদিন একটি শক্তি(শালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল এবং যতদিন একটি সাধারণ শত্রু অর্থাৎ মুঘলদের বি(দ্ধে একজোট হয়ে থাকার প্রয়োজন ছিল, ততদিন তারা একটি শিথিল জোটের তলায় ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর পরে যখনই প্রথম সুযোগ আসে তারা তাদের স্বশাসন আদায় করে নেয়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা ছিল মুঘলদের চেয়েও বিশৃঙ্খল। বহু মারাঠা সর্দার নতুন ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায়নি। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি(তে উৎসাহ দানে কিংবা ব্যবসা ও শিল্পে আগ্রহ বাড়াতে ব্যর্থ হয়। তাদের রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল মুঘলদের মতই। এছাড়াও মারাঠারা মূলতঃ অসহায় কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মোট কৃষিজ উৎপাদনের ৫০ ভাগ তারা কর আদায় করত। মহারাষ্ট্রের বাইরে একটি সুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ হয়। তাঁরা ভারতীয় মানুষকে উচ্চতর আনুগত্যে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে মুঘলদের চেয়ে বেশী সফল হতে পারেনি। তাদের রাজত্বও মূলতঃ শুধুমাত্র শক্তি(ও জবরদস্তির উপর টিকে ছিল। একমাত্র যেভাবে মারাঠারা ব্রিটিশ শক্তি(র বি(দ্ধে (খে দাঁড়াতে পারত, তা হল তাদের রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করে। কিন্তু তা করতে তারা ব্যর্থ হয়।

একক ১১ ❑ বিদেশী আত্র(মণ ঃ পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারত

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পিছনে সময়ে গু(ত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হল পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে ত্র(মাগত আত্র(মণ, যা শুধু মুঘলদের পতনেই জন্যই যে অনেকখানি দায়ী ছিল তাই নয়, ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতির উপরেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ১৭৩৮-৩৯ সালে নাদির শাহ যখন উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে অবতরণ করেন তখন সাম্রাজ্য এক অসহায় দর্শক মাত্র। পারস্যকে নিশ্চিত পতন ও ভাঙনের হাত থেকে বাঁচিয়ে নাদির শাহ সাধারণ রাখাল থেকে শাহ (রাজা) হয়েছিলেন। ঐ শতাব্দীর শু(র দিকে এতদিনের শক্তি(শালী ও সুদূর বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্য দুর্বল সাফাভি বংশের অধীন হয়ে পড়েছিল। এবং অর্ন্তবিদ্রোহ এবং বিদেশী আত্র(মণের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পূর্বদিকের আবদালি উপজাতীয়রা বিদ্রোহ করেছিল এবং হীরাট দখল করেছিল এবং ঘলজাই উপজাতীয়রা কান্দাহার প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিল। উত্তর এবং পশ্চিমেও একই ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। শিরজানে উগ্রবাদী শিয়াদের দ্বারা সুন্নীদের ওপর অত্যাচার সেখানে বিদ্রোহের সূচনা করে। সেখানে "সুন্নী মোল্লাদের মেরে ফেলা হয়। মসজিদগুলিকে অপবিত্র করা হয়, তাদের আস্তাবলে পরিণত করা হয় এবং ধর্মীয় শিল্পকে ধ্বংস করা হয়।" ১৭২১ সালে কান্দাহারের ঘাকই প্রধান মাহমুদ পারস্য আত্র(মণ করেন এবং রাজধানী ইসফাহান দখল করেন। পিটার দি গ্রেটের অধীনে রাশিয়া তখনও দ(িণে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। পিটার ১৭২২ সালে জুলাই মাসে পারস্যে আত্র(মণ শু(করেন এবং খুব শীগগিরই কাস্পিয়ান সাগরের পাশে বাকু শহর সহ বেশ কিছু অঞ্চল ছিনিয়ে নেন। বেশীরভাগ ইউরোপীয় অঞ্চল হারিয়ে তুরস্ক তখন তার (তি পুষিয়ে নিতে পারস্যের দিকে নজর দেয়। ১৭২৩ সালের বসন্তে তুর্কী পারস্যের বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং জর্জিয়ার মধ্যে দিয়ে দ(িণ দিকে অগ্রসর হয়। ১৭২৪ এর জুন মাসে রাশিয়া ও তুর্কী নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি(সম্পাদন করে সমগ্র উত্তর এবং পশ্চিম পারস্যের বেশ কিছু অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এই অবস্থায় ১৭২৬ সালে নাদির শাহ তাহম্স্প এর এক বড় সমর্থক এবং একজন অত্যন্ত দ(সেনাপতি হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ১৭২৯ সালে তিনি হীরাটের আবদালিদের পরাজিত করেন এবং ইসফাহান, মধ্য ও দ(িণ পারস্য থেকে ঘলজাইদের বিতাড়ন করেন। এক দীর্ঘ ও তিক্ত(যুদ্ধবিগ্রহের পর তিনি তুর্কীকে তার সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল ফেরৎ দিতে বাধ্য করেন। ১৭৩৫ সালে তিনি রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি(সম্পাদন করে সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল আদায় করেন। পরের বছর তিনি শেষ সাফাভি শাসককে অপসারণ করে নিজেই শাহ হন। পরের কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আবার কান্দাহার প্রদেশ অধিকার করেন।

ভারত চিরকালই তার অফুরন্ত ধনসম্পদের জন্য বিখ্যাত হওয়ায় নাদির শাহ সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একটানা যুদ্ধবিগ্রহ পারস্যকে এক রকম নিঃস্ব করে তুলেছিল। ভাড়াটে সৈন্যদলের খোরপোষের জন্য অর্থ ছিল অত্যন্ত জ(রী। ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত ধন একটি সমাধান হয়ে উঠতে পারত। একই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের দৃশ্যমান দুর্বলতা এই লুণ্ঠনকে সম্ভব করেছিল। ১৭৩৮ এর শেষের দিকে কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তিনি ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেন। অনেক বছর ধরেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুর(া অবহেলিত হচ্ছিল। বিপদ পুরোপুরি বোঝা যায় নি, যত(ণ না শত্রুপ(লাহোর দখল করে নেয়। দিল্লীর সুর(ার দ্রুত চেষ্টা করা হলেও, দলাদলীতে লিপ্ত অভিজাতরা শত্রুপ(ের মুখোমুখি এসেও ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করেন। তাঁরা সুর(ার কোনো পরিকল্পনায় কিংবা সৈন্যদলের কোনো সেনাধ্য(ের আদেশেই একমত হতে পারলেন না। অনৈক্য, অযোগ্য নেতৃত্ব, পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাস সহজেই পরাজয়ের পথ উন্মুক্ত(করে দেয়। দুই সেনাদল ১৭৩৯ এর ১৩-ই ফেব্রুয়ারী কামা নামক স্থানে মিলিত হয় ও আত্র(মণকারীরা মুঘল সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। সম্রাট মহম্মদ শাহকে বন্দী করে নাদির শাহ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। তাঁর কিছু সৈন্যের যুদ্ধে মারা যাবার প্রতিশোধ নিতে নাদির শাহ রাজধানীর মানুষের উপর এক

ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালানোর নির্দেশ দেন। এই লোভী আত্র(মণকারী রাজকীয় কোষাগার ও অন্যান্য রাজকীয় সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করেন, বিশিষ্ট অভিজাতদের কাছ থেকে রাজকর আদায় করেন এবং দিল্লীর ধনীদের ওপর লুণ্ঠন চালান। তাঁর লুণ্ঠনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭০ কোটি টাকার মত। এর সাহায্যে তিনি তাঁর নিজের রাজ্যকে করের বোঝা থেকে তিন বছরের জন্য মুত্তি(দিতে পেরেছিলেন। তিনি বিখ্যাত কোহ-ই-নুর হীরে ও শাহজাহানের রত্নখচিত ময়ুর সিংহাসনও নিয়ে গেছিলেন। সিন্ধু নদীর পশ্চিম পাড়ে যাবতীয় প্রদেশ সম্রাট মহম্মদ শাহ নাদির শাহকে অর্পণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

নাদির শাহর আত্র(মণ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রচন্ড (তি করেছিল। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্মানের অপূরণীয় (তি হয় এবং সাম্রাজ্যের অর্ন্তনিহিত দুর্বলতা মারাঠা সর্দার ও বিদেশী বণিক কোম্পানীগুলির কাছে প্রকট হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কিছুকালের জন্য পুরোপুরিভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এই আত্র(মণ সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার সর্বনাশ করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ঘটায়। দরিদ্র হয়ে যাওয়া অভিজাতরা বেপরোয়াভাবে কর চাপাতে থাকেন এবং তাদের হৃত ভাগ্যকে ফিরে পাওয়ার জন্য কৃষকদের আরও উৎপীড়ন করতে শু(করেন। তারা এখন আগের থেকেও মরীয়াভাবে ভাল জাগীর বা উচ্চ পদ পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকেন। সিন্ধুনদীর পশ্চিমদিকে কাবুল ও অন্যান্য প্রদেশ হারিয়ে ফেলার ফলে আবার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। সুর(ার একটি গু(ত্বপূর্ণ দিক ভেঙে পড়ে।

আশ্চর্যজনভাবে নাদির শাহের প্রস্থানের পরে সামাজ্য তার শক্তি(কিছুটা পুন(দ্ধার করতে স(ম হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আয়তন দ্রুত হ্রাস পায়। কিন্তু এই পুন(খান ছিল অসার ও তাৎপর্যশূন্য। ১৭৪৮ সালে মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর অসৎ ও (মতালোভী অভিজাতদের মধ্যে তিক্ত(সংঘাত ও গৃহযুদ্ধ শু(হয়। উপরন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সুর(া দুর্বল হয়ে যাবার পর, নাদির শাহের সুযোগ্য সেনাপতি আহম্মদ শাহ আবদালি, যিনি তাঁর প্রভুর মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার করতে স(ম হয়েছিলেন, তাঁর বারবার আত্র(মণে সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ১৭৪৮ থেকে ১৭৬৭ সালের মধ্যে আবদালি বারে বারে উত্তর ভারত আত্র(মণ করে দিল্লী, মথুরা পর্যন্ত লুণ্ঠন চালান। ১৭৬১ সালে তিনি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদেরও পরাজিত করেন। এইভাবে তিনি মারাঠাদের মুঘল সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ তথা রাষ্ট্রকে শাসন করার ইচ্ছায় আঘাত হানেন। যাই হোক তিনি ভারতবর্ষে নতুন করে কোনো আফগান রাজ্য স্থাপন করেননি। তিনি বা তাঁর বংশধররা পাঞ্জাব প্রদেশকেও ধরে রাখতে পারেননি এবং শীগগিরই তা শিখ প্রধানদের কাছে খুইয়ে ফেলেন। নাদির শাহ এবং আবদালির আত্র(মণে ও মুঘল অভিজাতবর্গের অর্ন্তদ্বন্দ্বে ১৭৬১ নাগাদ মুঘল সাম্রাজ্য সত্যিসত্যি একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যরূপে তার মর্যাদা হারায়। এটি শুধুমাত্র দিল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। দিল্লী প্রতিদিনের দাঙ্গা ও বি(োভের শিকার হয়ে পড়েছিল। মুঘলদের বংশধরেরা ভারতীয় সাম্রাজ্য বাঁচানোর জন্য কোন সক্রি(য় ভূমিকা নিতে উৎসাহী হননি বরং (মতালোভী অভিজাতরা তাঁদের নামের পিছনে লুকানকে রাজনৈতিকভাবে খুব সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। এর ফলে দিল্লীর সিংহাসন নামেমাত্র (মতার বদলে দীর্ঘকাল টিকে ছিল।

একক ১২ ❑ মুঘল পতনের ইতিহাস রচনা

গঠন

১২.০ মুঘল পতনের ইতিহাস রচনা
১২.১ অনুশীলনী
১২.২ গ্রন্থপঞ্জী

মুঘল পতনের ইতিহাস একটি খুবই গু(ত্বপূর্ণ বির্তকের বিষয় এবং গত ত্রিশ বছরে এই বিতর্ক একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করেছে। এই প্র(কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে যে মুঘল আমলের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার কোন ধারাবাহিকতা ছিল, নাকি কি আদৌ আর কোনো অস্তিত্ব ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল, এই বির্তকের একটি অত্যন্ত দীর্ঘ ঐতিহাসিক উৎস/উৎপত্তি আছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের এই পর্বের ইতিহাস মূলতঃ মুঘল শক্তি(র পতনের পরিপ্রে(িতে থেকেই রচিত হয়েছে। এই সময়ের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন উইলিয়ম আরভাইন (William Irvine) এবং যদুনাথ সরকার। তাঁরা সম্রাটদের ও অভিজাতদের চারিত্রিক অবনমনকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী করেছেন। আইন ও শৃঙ্খলার পরিপ্রে(িতে এই সময়ের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে যদুনাথ সরকার ঔরঙ্গজেবকেই অপরাধী সাব্যস্ত্য করেছেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যই তাঁর পতন ঘটেছিল। তিনি এমন কিছু অভিজাতবর্গকে আলাদা করে চিহ্নি(ত করেছেন যাঁরা একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যের মতই রাষ্ট্রের সেবা করেছেন। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা ও তাঁদের অধীনস্থ অভিজাতরা তাঁদের পূর্বপু(যদের ছায়ামাত্র ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারেননি। এই ব্যাখ্যা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত পারসিক ইতিহাস লেখকদের ব্যাখ্যার বাইরে রাঠোর, বুন্দেলা, মারাঠা এবং শিখদের মুঘলদের বি(দ্ধে মধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে পারেনি। একমাত্র পার্থক্য হল এই যে যদুনাথ 'হিন্দু প্রতিত্রি(য়া'র আভাস পেয়েছেন। অন্যদিকে, সমসাময়িক রচনায় বিদ্রোহী ও বিঘ্নকারী (disturbers)-দের তাদের শ্রেণী যেমন জমিদার, বা তাদের জাতি, গোষ্ঠী ও অঞ্চলের ভিত্তিতেই চিহ্নি(ত করা হয়েছিল। সরকারের ও তাঁর মত আরও বহু ঐতিহাসিকের বক্ত(ব্যকে তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিতেই দেখা ঠিক হবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকে বৈধ মনে হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মুঘল রাষ্ট্রকে মুসলিম গোঁড়ামির সঙ্গে যুক্ত(করার প্রবণতাকে তাঁরা সঠিকভাবেই চিহ্নি(ত করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন সঠিক হবে না যে এর ফলে সাম্রাজ্যে যে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় সেগুলি শুধুমাত্র হিন্দুদেরই প্রভাবিত করেছিল। বা হিন্দু প্রতিত্রি(য়াই সাম্রাজ্যের পতনের জন্য দায়ী ছিল। কেননা এই সব নীতির বি(দ্ধে মুসলমান আধিকারিক ও অভিজাতবর্গও একইভাবে প্রতিত্রি(য়া ব্যক্ত(করেছিল। আরও বলা যায় যে মুসলিম মাদাদ-ই-মাগের মালিকরাও স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্যের (েত্রে বড়সড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

১৯৫৯ সালে সতীশ চন্দ্রের "Parties and Politics at the Mughal Court 1707-40" বইটি আলিগড় থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই প্রথমবার মুঘল ব্যবস্থার গঠনগত ত্রুটিগুলির নীরিখে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে বিচার করার একটি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সতীশ চন্দ্রের মতে কেন্দ্রীয় শক্তি(হিসাবে সাম্রাজ্যের সুস্থিরতা সপ্তদশ শতাব্দীতে mtmsab fmdjagir-এর দ(কার্যপ্রণালীর ওপরেই নির্ভর করত। অভিজাতবর্গ (ওমরাহ) ছিল রাষ্ট্রের শ্রেণীত্র(মে (hierachy) এমন একটি আধিকারিক গোষ্ঠী যাদের অবস্থান ও সম্মান তাদের মনসবের পদমর্যাদা অনুযায়ী নির্ধারিত হত। তাঁদের সাধারণত ভূমিরাজস্ব (জাগির) অনুদানের মাধ্যমেই বেতন

দেওয়া হত। রাজস্বের প্রাপ্তি ও মুঘলদের দ্বারা তা সংগ্রহ করা মুঘল ব্যবস্থা পরিচালনা করার প(বড্ড জ(রী পূর্বশর্ত হয়ে পড়ে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ দিকে এই ব্যবস্থা পরিচালনার ((ত্রে মুঘলদের ব্যর্থতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছিল এবং তা কোনোমতেই লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না।

১৯৬৩ সালে ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব আলিগড় থেকে প্রকাশিত তাঁর দিশারী রচনা "The Agrarian System of Mughal India" গ্রন্থে সাম্রাজ্যের পতনের এক সচিন্তিত বি(-ষণ করেন। মুঘলরা রাজস্ব আদায়ের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তা ছিল সহজাতভাবেই ত্রুটিযুক্ত(। যখন উচ্চ মানের সামরিক শক্তি(বজায় রাখার জন্য রাজকীয় নীতি ছিল সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করা, তখন অভিজাতরা জাগীর থেকে যতদূর সম্ভব রাজস্ব নিংড়ে নিয়ে আদায় করে নিতে চাইত, তাতে যদি কৃষককুলের সর্বনাশ হত বা রাজস্ব দেবার (মতা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যেত সেদিকেও কোন মনোযোগ দেওয়া হত না। জাগীর যখন তখন হস্তান্তরিত হয়ে যাবার আশঙ্কায় অভিজাতরা কখনই কৃষির উন্নতিকল্পে কোন দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করেননি। কিছু এলাকার কৃষকরা তাঁদের জীবনধারণের সামান্য উপায় থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে কৃষকদের ওপর করের বোঝা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছু অঞ্চলে তাঁরা পালিয়ে গেছিল বা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছিল এবং মুঘল নীতির বি(দ্ধে (খে দাঁড়িয়েছিল। মুঘল কর্তৃত্বের ত্রি(য়াকলাপ প্রাক্-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প(ও ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছিল। মুঘল ব্যবস্থায় কৃষির উন্নতির জন্য কোনো অর্থ লগ্নী করার বা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালপত্রের বাজার সৃষ্টি করার জন্য কৃষকদের সঙ্গতি ছিল না বললেই চলে।

১৯৬৬ সালে আলিগড় থেকে প্রকাশিত আর একটি গ্রন্থে এম. আথার আলিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুঘল দরবারের অভিজাত ও তাদের রাজনীতি সম্পর্কে এক মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আথার আলি সতীশ চন্দ্রের কাজেও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এই দু'টি রচনায় দ(ণী রাজ্যগুলি দখল, মারাঠা ও দ(ণী শাসকদের মুঘল অভিজাতগোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা এবং পরবর্তীকালে জাগীরের অভাব মুখ্য স্থান পেয়েছে।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বিষয়ে একটি সাম্প্রতিক আলোচনাসভায় জে. এফ. রিচার্ডস, এম. এন. পিয়ারসন এবং পি. হার্ডির মত ঐতিহাসিকরা দ(ণ ও মারাঠাভূমিতে মুঘলদের অংশগ্রহণকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারীরা আগের দুই ঐতিহাসিকদের দেওয়া ব্যাখ্যাও সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। পিয়ারসন মুঘল ব্যবস্থায় একটি মূলগত ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিলেন। মুঘল শাসন যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্য(ছিল না এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন নয়, বরং স্থানীয় বন্ধন ও রীতিনীতিই বেশীরভাগ সময় বেশীরভাগ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করত। শুধুমাত্র অভিজাতদের ((ত্রেই অন্যান্য 'আদিম সম্পর্কের' চেয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ধারণা অনেক বেশী গু(ত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই অভিজাতবর্গ সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল, যে পৃষ্ঠপোষকতা সম্রাটের ত্র(মাগত সামরিক সাফল্যের উপরেই নির্ভর করত। পিয়ারসন এক নৈর্ব্যক্তি(ক আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি ও মুঘল রাষ্ট্রের উপরে তার প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন এবং প্রাক্-আধুনিক যুগে এশিয়া ও আফ্রিকায় সফল রাষ্ট্রের অনুপস্থিতির সেই বহুপরিচিত ব্যাখ্যাই উপস্থাপিত করেছেন।

এই কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে সম্রাটদের ব্যক্তি(গত সাফল্য বা ব্যর্থতা ও তাদের (য়িষ্ণু(সামরিক শক্তি(অভিজাতদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলত। পিয়ারসনের সূত্র অবশ্য এই সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থেকে গড়ে ওঠেনি। আমার মতে শুধুমাত্র অভিজাতদের ছোট গোষ্ঠী (উমারা) নয়, বরং আমিতুলার, গ্রামভিত্তিক কসবা-বা সেদ, মাদাদ-ই-মাশ (qasba-ba-sed-madad-i-ma'ash) অধিকারী ও বিভিন্ন আঞ্চলিক ও স্থানীয় সম্প্রদায়ভুক্ত(অসংখ্য নিম্নশ্রেণীর আধিকারিকরা সাম্রাজ্যের কাঠামোর ভিতর গভীরভাবে অন্তর্ভুক্ত(ছিল। মুঘল সাম্রাজ্য পরস্পরবিরোধী এই সব শক্তি(র মধ্যে ভারসাম্য র(ার উপর নির্ভর করেই টিকে ছিল। কিন্তু একথাও সত্যি যে রাজকীয় ব্যবস্থা কখনই জমিদারদের স্থানীয় গোষ্ঠী ও বিশেষতঃ আত্মীয়, গোষ্ঠী ও জাতির প্রতি প্রাথমিক বন্ধন

ছিড়তে বা তাকে অতিত্র(ম করতে পারেনি। সংঘাতশীল সম্প্রদায়সমূহ ও বিভিন্ন স্তরে গড়ে ওঠা দেশজ সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বয়কারী সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছিল। রাষ্ট্রের ভিত্তিই ছিল নেতিবাচক। স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির সঙ্কীর্ণ বন্ধনগুলির উর্ধ্বে উঠে একত্রিত হবার অ(মতার সুযোগ নিয়েই সাম্রাজ্য শক্তি(সঞ্চয় করেছিল।

মুঘল ভারতে রাজনৈতিক সংহতি নিজস্ব কারণেই সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি। এই সংহতি স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি(দের দ্বারা চালিত বিভিন্ন সামাজিক দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধনের শর্তাধীন ছিল। পদমর্যাদা ও (মতার জন্য অভিজাতরা যে সম্রাট তাদের নিয়োগ করেছেন, তাঁর ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁদের কোনো বংশানুত্র(মিক জাগীর ছিল না যাকে তাঁরা আরও সমৃদ্ধিশালী করবেন কিংবা উত্তরাধিকারীকে দান করবেন। তাঁদের সম্পদের উপর রাষ্ট্রই নজর রাখত ও নিয়ন্ত্রণ করত। প্রকৃতপ(তাঁরা ছিলেন বেতনভোগী অসামরিক ও সামরিক কর্মচারী(তারা সম্রাটকে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করতেন। তা সত্ত্বেও অভিজাতবর্গের নিজেদের কিছু টানাপোড়েন ছিল। জাগীর হস্তান্তরের মাধ্যমে আভিজাতদের ব্যক্তি(গত প্রভাব বাড়তে না দেওয়ার যে নীতি গৃহীত হয়েছিল তা রাজকীয় সংগঠনকে শক্তি(শালী করার উদ্দেশ্যেই গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে অভিজাতবর্গের বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে তাঁরা এই ব্যবস্থা চালু করার বিরোধী ছিলেন। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু (ে ত্রে এই নীতি বলবৎ করা যায়নি।

সুতরাং এই যুগে অভিজাতদের কার্যকলাপ ও নিজস্ব (মতা বাড়াতে জমিদারদের সঙ্গে তাদের স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপন পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সাথে সম্পূর্ণ বেমানান ছিল না।

স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির নের্তৃবর্গ, যাদের সাধারণত জমিদার বলেই আমরা চিনি, তাঁরা আসলে বংশানুত্র(মিকভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি(ছিলেন। মূলগতভাবে, তাদের পদমর্যাদা, শক্তি(ও সম্পদ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিলনা। কিন্তু জাতি, গোষ্ঠী ও অঞ্চল বিভেদে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট বিভক্ত(ছিলেন ও প্রায়ই একে অপরের বি(দ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। প্রত্যেক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে ভয় পেত এবং প্রত্যেকেই অন্য গোষ্ঠীর প্রকৃত বা সম্ভাব্য দখলদারীর ভয়ে যথেষ্ট সর্তকতা ও পাহারাদারীর ব্যবস্থা করত। ওই যুগের সামাজিক অবস্থা বিভিন্ন স্থানীয় সম্প্রদায়কে একত্রিত হবার খুব কমই সুযোগ দিত। যে শক্তি(আত্মীয়তা, গোষ্ঠী, অঞ্চল ও ধর্মের উর্ধ্বে উঠে একটি জাতীয় চরিত্র দিতে পারত, সেই শক্তি(র অধীনে তারা চিরকালই পদানত ছিল। এমন একটি বিশাল শক্তি(প্রত্যেকে গোষ্ঠীরই নিজস্ব প্রভাব হারাবার ভীতিকে অনেকখানি দূর করতে স(ম হত। সুতরাং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক শর্তগুলিই মুঘল রাজকীয় অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় প্রত্যেকটি (ে ত্রে কোনো স্থানীয় সম্প্রদায়ের বি(দ্ধে যখনই মুঘল বাহিনী বিজয়লাভ করেছে, তাতে অন্য কোনো স্থানীয় বাহিনীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ।

সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থানীয় দলগুলির এই একাত্ম হবার চেষ্টার ভিত্তি ছিল সঙ্কীর্ণ ও নেতিবাচক। রাষ্ট্রের প্রতি জমিদারদের এই বশ্যতা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি(র উপরে নয়, বরং নিরাপত্তার শর্তাদি সৃষ্টির ওপরেও নির্ভরশীল ছিল। জমিদাররা অনেক (ে ত্রেই কার্যত কোনো অঞ্চলের শাসক হয়ে উঠতেন(যে সব শর্তাদির দ্বারা তাঁরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন তাও ঐ অঞ্চলে লোকেদের শক্তি(বা দুর্বলতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল। এই সব অঞ্চলের অবস্থা একই জায়গায় আটকে ছিল না। আমরা দেখতে পাই এই সব অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছিল এবং এর ফলে জমিদাররা ও তাদের অনুচরবৃন্দ আত্মবি(্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বাবলম্বীভাবে দাঁড়ানোর শক্তি(সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁদের পূর্বেকার নিরাপত্তাহীনতার বোধ অনেকটাই দূরীভূত হয়েছিল। সুতরাং সম্রাট ও অভিজাতবর্গের ব্যক্তি(গত ও সামরিক ব্যর্থতার নিরিখেই মুঘল ব্যবস্থার অস্থিরতাকে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না।

১৬৯০ সাল নাগাদ দাি(ণাত্যে ব্যবহারযোগ্য জাগীরের অভাব ছিল এক কৃত্রিম ঘটনা, এই বক্ত(ব্যের মাধ্যমে জে. এফ. রিচার্ডস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুঘল প্রশাসনের কিছু সমস্যার এক গু(ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা রেখেছেন। দাি(ণাত্যে অপ্রতুলতার এক দীর্ঘকালীন ধারণাকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন যা থেকে এই বি(্বাসের উদ্ভব ঘটেছিল যে বেজাগিন (জাগিরের অভাব) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নতুন আবিষ্কৃত দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি থেকে সতীশ চন্দ্র একটি সমী(া চালিয়েছেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ব্যাখ্যায় বে-জাগিন ও জাগিরদারী ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য খুব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে জাগীরদারী ব্যবস্থায় সমস্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল এর অকার্যকারিতা—শাসক শ্রেণীর আয়তন বৃদ্ধি ও রাজস্বের পরিমাণ কমা নয়, যে জমি ইনজাগির (পাইবাকি) হিসাবে অর্পণ করা ছিল নির্দিষ্ট। সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুঘল প্রশাসনের সমস্যাগুলি বি(ে-ষণের (ে ত্রে "স্থানীয় যুদ্ধবাজ অভিজাততন্ত্রের" ভূমিকায় রিচার্ডস সঠিকভাবেই জোর দিয়েছেন। সতীশ চন্দ্রের মতে জাগীরদার, জমিদার ও খুদকাশ্ত্ (আবাসিক কৃষক) প্রমুখের মধ্যে বর্তমান "ত্রিমে(সম্পর্কই" মুঘল সাম্রাজ্যের সুস্থিরতা বজায় রাখার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল। অবশ্য কোথাও এই সম্পর্কের বহমানতা ঐ গোষ্ঠীগুলি অর্থাৎ জাগীরদার, জমিদার ও কৃষকদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত(হয়নি। রিচার্ডস মাঝে মাঝে সম্রাটের সিদ্ধান্ত ও নীতির আলোকেও সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই ত্রিমে(সম্পর্কের সমস্যাগুলির একটি পরী(া আবশ্যক। উপরন্তু এক বিশাল সংখ্যক স্থানীয় গোষ্ঠীর (অযোধ্যার শেখজাদা, পাঞ্জাবের (াত্রী) মধ্যে মাদাদ-ই-মাশ (madad-i-naash) আধিকারিকদের ভূমিকাও আমাদের বিবেচনাযোগ্য। এদেরকে রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল বা রাষ্ট্রের আধিকারিক কিংবা বিশাল কোনো অভিজাতর সাঙ্গপাঙ্গ হিসাবে দেখলে চলবে না, বরং তাঁদের স্থানীয় মানুষদের মধ্যে মিশে থাকা উপাদানের মত দেখতে হবে।

চিরাচরিতভাবে যেসব দলকে অ-রাজনৈতিক হিসাবে ভাবা হয়, অষ্টাদশ শতকে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণও মুঘল পতনের জন্য কম দায়ী ছিল না। ক্যানের লিওনার্ড এই যুক্তি(উত্থাপন করেছেন যে "দেশজ লগ্নী সংস্থাগুলি (banking firms) ছিল মুঘল রাষ্ট্রের অপরিহার্য মিত্র ছিল। অভিজাত শ্রেণী এবং রাজার কর্মচারীরা এই সংস্থাগুলির ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। ১৬৫০-১৭৫০ ব্যাপী সময়ে যখন এই লগ্নী সংস্থাগুলি যখন তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন সদ্যজাত আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও শাসকদের যেমন বাংলায় বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতি বাড়িয়ে দেয়, তখন তার ফলস্বরূপ বাংলা দেউলিয়া হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় ও সাম্রাজ্যর পতন ঘটে। যে সিদ্ধান্তগুলিকে সত্যি ধরে নিয়ে লিওনার্দ তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেগুলি মুঘল রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতির সমী(ায় যথেষ্ট সর্মথন পায়নি। তা সত্ত্বেও তাঁর বক্ত(ব্য যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য এবং তাকে একেবারে ফেলে দেওয়া চলে না। ফিলিপ কালকিন্স্ (Philip Calkins) প্রথম অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় রাজনৈতিক সমীকরণে বণিক ও কুসীদজীবির (bankers) ভূমিকা নিয়ে নিষ্ঠাভরে কাজ করেন। গুজরাট নিয়ে পিয়ারসনের কাজেও রাজনীতিতে বণিকদের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও পিয়ারসন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া থেকে বিরত থেকেছেন যে মুঘল আর্থিক ব্যবস্থা শুধুমাত্র বণিকদের ঋণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ক্যালকিন্স্ও তার মতামতকে শুধুমাত্র যে সময়কাল ও যে অঞ্চল নিয়ে তিনি সমী(া করেছেন, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। পূর্ববর্তী সময়ে বা অন্য কোনো অঞ্চলে বণিকদের ভূমিকাকে তিনি সাম্রাজ্যের সুস্থিরতার জন্য দায়ী করেননি। তাঁর বক্ত(ব্যের প্রতি নতুন কোনো প্রমাণের সর্মথন ছাড়াই, লিওনার্ড ক্যালকিন্স্ ও পীয়ারসনের মতামতকে আবদ্ধ প্রসারিত করে কুসীদজীবিদের ভূমিকার কথা অনুচিত ও অতিরঞ্জিতভাবে পেশ করেছেন। বণিকদের রাজনৈতিক অবস্থানের আসল প্রকৃতি চিহ্নি(ত করা খুবই মুস্কিল। কেননা যে পারসিক উপাদানগুলির ওপর এই সমী(া দাঁড়িয়েছিল তাতে চিরাচরিত অ-রাজনৈতিক শহুরে গোষ্ঠীর সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়।

যাই হোক (াত্রীদের অভিজাত (উমারা) এবং বিশিষ্ট (আ'য়ন) হিসাবে উল্লেখ করার কিছু উদাহরণ পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বড় বণিক (শাহুকার) ও কিছু হস্তশিল্পী শিখদের বি(দ্ধে মুঘল অভিমানকে সমর্থন করেছিল। এই ঘটনাই নির্দেশ করে যে অন্ততঃ মুঘল ভারতের কিছু অংশে বণিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু এও সম্ভব যে বণিকদের স্বার্থ শাসক শ্রেণীর প্রতিপত্তি ও সুস্থিরতা ও তাঁরা যে বাজারকে জিইয়ে রেখেছিলেন, তার ওপরেই নির্ভরশীল ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের ঠিক আগে যখন তাঁদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন তাঁরা রাজনীতিতে সত্রি(য়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শু(করেন। এমন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ঐতিহ্যসম্পন্ন একটি শ্রেণী কখনই নিষ্ি(য় দর্শক হয়ে থাকবে না, যদি তাঁরা মনে করে থাকে যে তাঁদের সমর্থন পেলে আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হবে। "সামাজিক সঙ্কট" হল স্মিথ, কে.এম. আসরফ, ইরফান হাবিব এবং আথার আলির রচনার মূল সুর। "Kem 73e" clinee অনুযায়ী সমাজ একটি ব্যাপক সর্বভারতীয় রাষ্ট্রনীতির জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট উদ্বৃত্ত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্য কথায় বলা যায়, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা যদি রাজনৈতিক পতনের আগে নাও এসে থাকে, তা রাজনৈতিক পতনের সঙ্গে একসাথেই এসেছিল। পতনের পর্বটি যে এক চরম বিশৃঙ্খলার সময় ছিল এই বি(াস তাদের রচনাতেও স্থান পেয়েছে, যারা "পতন" শব্দটির জায়গায় "বিকেন্দ্রীকরণ" শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তি(যুক্ত(মনে করেছেন। অষ্টাদশ শতকের শু(র দিকে সমাজ ছিল কিছুটা অস্থির। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অনিবার্যভাবে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ গড়ে উঠছিল। কিন্তু এই অস্থিরতার সঙ্গে উৎপাদন ও বাজারের (ে ত্রের ব্যর্থতার সম্পর্কটা ঠিক স্পষ্ট নয়। ভারতীয় ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী, বিশেষত এর প্রথমার্ধ, ছিল এক দুঃখজনক সময় কারণ মুঘলদের রাজনৈতিক গৌরব ও ঔপনিবেশিক শাসনের লাঞ্ছনার মত দুই বিপরীত ঘটনার মধ্যে এর অবস্থান। যেসব বৃটিশ ঐতিহাসিক ভারতের অতীত সম্বন্ধে প্রথম আধুনিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন, এই সময়ের এক নিষ্প্রভ চিত্র আঁকার পিছনে তাদের নিজস্ব স্বার্থ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু আধুনিক রচনায় ব্রিটিশ বক্তব্যগুলিকে অকুণ্ঠভাবে মেনে নেবার এক প্রবণতা ল(্য করা যায়। সমসাময়িক কিছু পারসিক ধারাবিবরণীতেও এই সময়কে একটি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতার যুগ বলে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। এর ফলে শুধু যে ব্রিটিশ লেখকদেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে তাই নয়, তাঁদের ব্যাখ্যাগুলিকেও তা উৎসাহ দান করেছে। এই মতামতগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও আরও কিছু ঘটনা সম্পর্কে আমাদের বোধকে এখনও প্রভাবিত করে। মুঘল রাজকীয় ব্যবস্থার সবচেয়ে বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী ছিল অভিজাতরা। এই ধারাবিবরণী রচয়িতারা বেশীরভাগই ছিলেন অভিজাতদের আশ্রিত ব্যক্তি(। তাই তাদের রচিত ধারাবিবরণী সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। আঞ্চলিক শক্তি(গুলি রাজকীয় নিয়ন্ত্রনকে প্রতিরোধ করে দিল্লী থেকে কিছুটা স্বাধীনতা আদায় করতে স(ম হওয়ায় এই অভিজাতবর্গকে কষ্ট পেতে হয়েছিল। তাঁদের বিপর্যয়কে এইসব ধারাবিবরণীতে সমগ্র সমাজের অব(য় ও পতন হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে মুঘল সিংহাসন ও সম্রাটের ব্যক্তি(গত ছিল তাদের সমস্ত ধারণার কেন্দ্রবিন্দু, কাজেই রাজকীয় সৌধের পতন ও সমাজের পতন তাদের কাছে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাণিজ্যিকীকরণ এবং গোষ্ঠীগঠনের বিষয়গুলি এই গ্রন্থে আলোচিত গোটা সময় জুড়ে অবস্থান করেছে। এরকমই আরেকটি বিষয় হল বিভেদীকৃত ও শ্রেণীবিন্যস্ত শক্তি(র প্রকৃতি যার সাহায্যে অঞ্চলগুলিকে ব্যাপকস্তরের কিছু পরিবর্তন থেকে আড়াল করা যায় এই বিষয়টি আমাদের ঐতিহাসিক বি(-ষণের মধ্যে অস্পষ্টতা ও বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। একথাও জোর দিয়ে মনে রাখতে হবে যে ভারতে "সাম্রাজ্য" ও "রাজ্য", এই দুটি ধারণাই ছিল সীমাবদ্ধ। এর কারণ এই ছিল না যে ভারতীয় সমাজ জাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যাতে রাষ্ট্র খুব গভীর শিকড় ছড়াতে পারেননি, যদিও বহু প্রাচ্যবাদী এই ধারণায় বি(াসী। বরং এর কারণ ছিল রাজকীয় (মতা ও মর্যাদার অনেক দাবীদার যাদের অধিকার ও দায়িত্ব ছিল প্রায়ই একইরকম।

মুঘলরা সামগ্রিক কর্তৃত্ব দাবী করলেও, কখনো কখনো তারা শুধু রাজনৈতিক কর্তৃত্বই অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু বেশীরভাগ হিন্দু প্রজার কাছে ভারতে (মতা ও কর্তৃত্বের অর্থ ছিল মোটামুটি এক জটিল শ্রেণীত্র(ম মাত্র, যার সঙ্গে 'সরকার' বা 'প্রশাসনের' পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক নেই। চেয়ে বেশী একটি জটিল শ্রেণীবিন্যাসের মতই ঠেকত। মুঘল সম্রাট ছিলেন শাহ্ আন-শাহ্ অর্থাৎ রাজার রাজা, শুধুমাত্র ভারতের রাজা নয়। তিনি ছিলেন কর্তৃত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ, আপীলের সর্বোচ্চ আদালত এবং মুসলমানদের জন্য তিনি ছিলেন পয়গম্বর মহম্মদের একজন পার্থিব উত্তরাধিকারী। কিন্তু রাষ্ট্রের ল(ণ বলতে আমরা যা বুঝি, তা সম্রাট বা তার অনুগতদের মধ্যে নয়, তা দেখা যেত আঞ্চলিক হিন্দু রাজা বা অভিজাতদের মধ্যে, যাদের উপর গ্রামের সম্পদ ও কতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব থাকত। যদি অর্থ, সৈন্য ও সম্ভ্রম আদায় করে নিতে স(ম হলে সম্রাট বিশাল (মতা ও সম্পদের প্রভু হতে পারতেন। তিনি ছিলেন ছোট খাট রাজাদের মালিক এবং (মতার উদ্যোগপতি। প্রধানত রাজকীয় সভা বা দরবারে সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করা হত।

রাজারা জাতি বিন্যাসের অভিভাবক ও হিন্দু ধর্মের মুখ্য যজ্ঞকর্তা হিসাবে গু(ত্ব লাভ করলেও যোদ্ধা কৃষক, যারা গ্রামগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। গ্রামের এইসব (মতাবান ব্যক্তি(রা রাজ্যশাসনের গূঢ় বিষয়গুলিতেও যোগদান করতেন। আসলে তাঁরাই ছিলেন ভারতের মানুষ ও সম্পদের প্রধান র(াকর্তা। এই ধরনের বেশ কিছু বি(দ্ধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি(যারা অতিরিক্ত(কর আদায় রোধ করতে বা নিজেদের যোদ্ধা রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারত, গাঙ্গেয় উপত্যতা ইত্যাদি অঞ্চলে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। এই জোটগুলিই মুঘলদের সর্বভারতীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘোষণা করেছিল।

কিছু ঐতিহাসিক এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে '(মতার স্তর' (levels of power) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই বক্ত(ব্য খুবই সুবিধাজনক, শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ত্র(মাগতঃ যোগাযোগ, মৈত্রী স্থাপন ও মৈত্রী ভাঙ্গ ন বিভিন্ন স্তরে হয়েই চলেছিল। এমনকী শক্তি(শালী সম্রাটদের আমলেও শ্রেণীবিন্যাসের ত্র(মাগতঃ পরিবর্তন হত। গ্রাম্য কৃষক-যোদ্ধারা (মতার দিক দিয়ে তাদের প্রতিবেশীদের অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছিল এবং রাজসভা থেকে তাঁরা রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একইভাবে রাজসভার পরিচালক, বহিরাগত মুসলমান এবং ভারতে বসবাসকারী হিন্দু ও মুসলমানরা তাদের কর্তৃত্ব খাটিয়ে জমিদারী দখল করে ছোট শহর বা গ্রামে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারত। এম. আলামের গবেষণামূলক রচনা "The Crisis of the Mughal Empire" প্রকাশিত হবার পর এই বিতর্ক এখনও চলছে।

১২.২ অনুশীলনী

১. কৃষি ও শিল্পের নিশ্চলতা মুঘল রাষ্ট্রের কাজকর্ম কিভাবে ব্যাহত করে? এটি কীভাবে রাষ্ট্রের ভাঙন ঘটায়?
২. তুমি কি মনে কর মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক ঘটনা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কিছু প্রভাব থেকে গেছিল।
৩. আঞ্চলিক রাজ্যগুলির উদ্ভব কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল? তুমি কি মনে কর যে এর ফলে জাতীয়তাবাদ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
৪. মুঘল রাষ্ট্রকে কতদূর একটি ভারতীয় রাষ্ট্র বলা চলে? অষ্টাদশ শতকের সমস্যার প্রসঙ্গে তা ব্যাখ্যা কর।
৫. তুমি কি মনে কর নাদির শাহের ভারত আত্র(মণের কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক ছিল? এর রাজনৈতিক গু(ত্ব আলোচনা কর।

৬. মুঘল পতনের ইতিহাস-রচনা (Historiography) সম্পর্কে আলোচনা কর। মুঘল সাম্রাজ্যে কি সত্যিই কোনো সমস্যা ছিল?

৭. মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সূত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বির্তকগুলি আলোচনা কর।

৮. অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভুত মারাঠা স্বরাজ্যের প্রকৃতি আলোচনা কর। এই ধারণা বিকাশে আঞ্চলিক রাষ্ট্র ভাবনা কতদূর সহায়ক হয়েছিল?

১২.৩ গ্রন্থপঞ্জী

1. M. Athar Ali– The Mughal Nobility under Aurangzeb.
2. Barnett Richards–North India between empires, Awadh, the Mughals and the British.
3. Bayly, C.A.–Rulers, Townsmen and Bazars : North Indian Society in the Age of British Expansion, 1700–1870.
4. Chandra Satish – Party and Politics in the Mughal Court.
5. Duff. I.G. – A History of the Marathas.
6. Habib Irfan – The Agrarian system of Mughal India.
7. Owen S.G. – The fall of the Mughal Empire.
8. Sarkar J.N. – A Study of Eighteenth Century India.
9. C.A. Bayly– The New Cambridge History of India – Vol.-II.
10. Alam M. – The crisis of empire in Mughal North India.

একক ১৩ ❑ অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি

গঠন

১৩.০ প্রস্তাবনা, অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতে

১৩.১ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামো

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে এই পর্যায়ে, ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে ত্র(মশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে (মতা দখলের সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কোম্পানী মুঘলদের উত্তরাধিকারী হিসেবে কেন্দ্রীয় শক্তি(র শূন্যস্থান পূরণ করতে উদ্যোগী হয়। এছাড়াও বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিরোধ ও পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

১৩.১ অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের উপস্থিতি ও ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামো

প্রায় চারশ বছর আগে জাভার বান্টাম বন্দরে চারটি বৃটিশ জাহাজ উপস্থিত হয়। পরের বছর গ্রীষ্মকালে জাহাজ বোঝাই করা মরিচ নিয়ে তারা দেশে ফিরে যায়। একটি স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র বা কারখানা স্থাপনের জন্য অল্প কিছু সৈন্য তারা রেখে যায়। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করার জন্য লন্ডনের বণিকদের কোম্পানীকে রানী এলিজাবেথের সনদ দান করার দু-বছর পর ভারত মহাসাগর ও দূর প্রাচ্যে বৃটিশদের আগমনের সূত্রপাত হয়।

পরবর্তী প্রায় ২৩৩ বছর, দ(িণ ও পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় বাণিজ্যের উপর কোম্পানী আধিপত্য বিস্তার করে এবং লন্ডন থেকে প্রায় ৪,৬০০ বার সমুদ্র যাত্রা করা হয়। ১৬২০ এবং ১৭০০ সালের মধ্যে যাওয়ার সময় চওড়া কাপড়, লোহা, রূপা এবং ফিরে আসার সময় মরিচ নিয়ে বছরে প্রায় ৮টি জাহাজ যাতায়াত করত। ১৮০০ সালের পর বছরে গড়ে ৪২টি জাহাজ আসাযাওয়া করত। জাহাজবাহিত পণ্যের পরিমাণও খুব বেড়ে যায় যার মধ্যে প্রধান ছিল চা। এই কাজের মাধ্যমে কোম্পানী বৃটেনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এশিয়ার সামগ্রিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণের তুলনায় কোম্পানীর বাণিজ্য ছিল যথেষ্ট অল্প।

এশিয়ার সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল এক অন্যতম ঐতিহাসিক শক্তি(যা আধুনিক বি(্বায়নের উন্মেষ ঘটায়। একবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য বৃটিশ চেতনা থেকে ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রায় হারিয়ে গেছে। এই কোম্পানীর কিছু কিছু চিহ্(অবশ্য এখনও লন্ডন শহরে থেকে গেছে। যেমন, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শূন্য পোতাশ্রয়, যেটি এখন গগনচুম্বী আধুনিক অট্টালিকাবেষ্টিত এবং বিশাল একটি পণ্য রাখার গুদাম, যা এখন কিছু কোম্পানীর কার্যালয় এবং কয়েকটি বাসগৃহে পরিণত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রভাব আমাদের (চি, ভাষা ও ইতিহাসে থেকে গেছে।

ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অগ্রগতির (ে ত্রে কোন নতুন বিশেষত্ব ছিল না। প্রায় একশ বছর আগে থেকেই পর্তুগীজরা ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করছিল এবং প্রায় ছয় বছর আগেই ডাচরা বান্টামে উপস্থিত হয়। অন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির মতই, ইংরেজরাও জটিল ও উন্নত বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ছাড়াই ভারত মহাসাগরে আসে। যদিও নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তারা সামরিক শক্তি(র সাহায্য নেয় তবুও বাণিজ্য বিস্তারের জন্য প্রতি (ে ত্রেই তাদের এশীয়দের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।

১৬১৪ সালে বৃটিশরাজ প্রথম জেমস তাঁর ব্যক্তি(গত রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রোকে গুজরাটে কোম্পানীর ব্যবসার জন্য সুযোগসুবিধা আদায় করতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায় পাঠান। কুড়ি বছর পর একজন হিন্দু রাজপুত্র মাদ্রাজে কোম্পানীকে আমন্ত্রণ জানালে, সেখানে কোম্পানী তাদের প্রথম দুর্গ সেন্ট জর্জ স্থাপন করে। ১৬৬১ সালে পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারিনকে বিবাহের যৌতুক হিসেবে দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্র বোম্বে লাভ করেন। ১৬৯৬ সালের পর কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্রে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পেলে বাংলায় কোম্পানীর বাণিজ্য সুসংগঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শু(তে তিনটি শক্তি(শালী দুর্গ ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যেই ভারতে ইংরেজদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় শাসকদের অনুমতি এবং ব্যবসার (ে ত্রে ভারতীয়দের সহযোগিতার উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করত।

ভারতীয় বাণিজ্যে সবচেয়ে মূল্যবান পণ্য ছিল দ(তাঁতীদের দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র। তাঁতে কিছু কাপড় বুনে সোনালি ও রূপালি সুতো দিয়ে তাদের উপর কাজ করা হলেও ভারতীয়দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দ(তা ছিল বস্ত্ররঞ্জন পদ্ধতিতে এবং হাতে আঁকা বা কাঠের টুকরোর মাধ্যমে সুন্দর নকশা ও বর্ণবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার (ে ত্রে।

সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় প্রত্য(ভাবে চীনের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য ইংরেজ কোন চেষ্টা করে নি কারণ চীন একমাত্র ম্যাকাও দ্বীপে পর্তুগীজদের ছাড়া অন্য কোন বন্দরে ইউরোপীয়দের প্রবেশাধিকার দিত না। কিন্তু ১৬৭২ সালে ইউরোপীয়রা তাইওয়ানে প্রবেশ করে এবং শতাব্দীর শেষে মূল ভূ-খন্ডের অন্তর্গত ক্যান্টনে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলে। যেখানে কঠোর শর্তের অধীনে থেকে ব্যবসা চালাত। চৈনিক রাষ্ট্র বিদেশী বর্বরদের প্রতি ঘৃণার কনফুসীয় নীতি সমর্থন করত এবং ইউরোপীয়রা বিপজ্জনক হতে পারে এই ধারণায় তাদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখত। ক্যান্টনে শহরের প্রাচীর ও নদীতীরের মধ্যবর্তী স্থানে ইউরোপীয়দের কারখানাগুলি গড়ে ওঠে। প্রতি বছর জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কারখানায় বসবাসের অনুমতি পেলেও মূল শহরে ইউরোপীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। বাণিজ্যকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত হপ্পো নামে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের একজন প্রতিনিধি এবং হং নামে সরকার অনুমোদিত পাইকারী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায়।

প্রথমদিকে চৈনিক বাণিজ্যে সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ পণ্য ছিল চা। ফোটান জলে মিশ্রিত চা পাতা মদের চেয়েও গু(ত্বপূর্ণ দৈনিক পানীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চায়ের স্বাস্থ্যকর উপাদান এবং তার প্রাচ্যদেশীয় অভিনবত্বের গুণে পাশ্চাত্যে চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ক্যান্টনের সমগ্র বাণিজ্যের ৬০% দখল করে চা এবং প্রায় একশ বছর পর চায়ের উপর ধার্য শুল্ক থেকে বৃটিশ সরকারের বার্ষিক রাজস্বের প্রায় ১০% আসত। চায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে চীনামাটির আমদানী শু(করে কোম্পানী। অত্যাধিক চাহিদার জন্য চীনে অভূতপূর্ব মাত্রায় রৌপ্যমুদ্রা আসতে থাকে।

ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সময়ে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়, তা পূরণ করতে বাণিজ্যিক সংস্থার ভূমিকা ছেড়ে কোম্পানী (মতা দখলের লড়াইতে লিপ্ত হয়। ১৭৬৫ সালে ভারতের সবচেয়ে ধনী রাজ্য বাংলার প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীয় এবং রাজস্বসংত্র(ান্ত দায়িত্ব পেয়ে কোম্পানী একটি আঞ্চলিক শক্তি(তে পরিণত হয় বাংলা দখল করে চীনে ত্র(মবর্ধমান আফিমের চাহিদা মেটাতে সেখানে আফিমের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায় কোম্পানী। ১৭৭৩ সালে মুঘলদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কিছু পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের (ে ত্রে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে কোম্পানী। বাংলায় আফিম উৎপাদনের উপর এই অধিকার করা হয়। কলকাতায় জনসম(ে নীলামে বিক্রি(হবার পর চীনে নিষিদ্ধভাবে আফিম সরবরাহ করা হত। ১৮২৮-২৯ সালে আফিম ভর্তি ১২,৬৬৫টি বাক্স চীনে পৌঁছয়। ক্যান্টনের প্রশাসকদের সঙ্গে বিরোধ এড়ানোর জন্য কোম্পানীর জাহাজে আফিম বহন নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবর্তে কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ী এই আফিম সংগ্রহ করত এবং পার্ল নদীর মোহনায় লিন্টিন দ্বীপের কিছু বেপরোয়া বাণিজ্যিক সংস্থা সেই আফিম জাহাজে থেকে নামাত। আফিমের ব্যবসায় দুর্নীতিগ্রস্ত কিছু চৈনিক আমলা ও শুল্কবিভাগের

কিছু কর্মচারীদের সমর্থন ছিল। লিন্টিনে আফিম বিত্র(ী করে প্রাপ্ত অর্থ ক্যান্টনে কোম্পানীর কারখানায় দেওয়া হত। এর ফলে এই অর্থ কলকাতা ও লন্ডনে পাঠিয়ে কোম্পানীর বৈধ কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয়।

ভারতে বৃটিশ শাসন স্থাপিত হলে দেশের সম্পদ প্রবাহের (ে ত্রে এক অতি গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। ১৭৫৭ সালে রাজনৈতিক (মতা দখলকারী ইংলিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিছক একটি ভারতীয় রাজ্য ছিল না। কোম্পানীর শাসন শু(হলে যে গু(ত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা দেয় সেটি হল ভারত ও বৃটেনের মধ্যে অসাম্যমূলক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কোম্পানী বাংলার রাজস্ব ব্যবহার করত। বৃটেন থেকে ভারতে সোনারূপ রপ্তানী (ীণ হতে থাকল। পরিবর্তে বাংলার রাজস্ব ব্যবহার করেই বৃটিশরা ভারতীয় পণ্য কিনত। প্রথমদিকে বাংলা ও পরে উত্তর ভারতের বহু রাজ্যের রাজস্ব শুধু বৃটিশ শক্তি(নয়, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য র(া করার জন্য ব্যবহৃত হত। বৃটেনে শিল্পবিপ-বের পর ভারতে সোনারূপ পাঠান বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের কাঁচামাল বৃটিশ শিল্পের জন্য রপ্তানী করা হত এবং ভারত বৃটিশ পণ্যের একটি বাজারে পরিণত হয়। সম্পর্কের এই অসাম্য বৃটেনের সঙ্গে নিছক এক কেজো বা ব্যবহারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে। ভারতে কর্মরত বৃটিশ কর্মচারীরা খুব কম (ে ত্রেই তাদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসত। ভারত তাদের বাসস্থানে পরিণত হয়নি। এখানে মুঘল অভিজাতরাও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। এভাবে ভারতে বৃটিশদের বেতন ও অবসরগ্রহণের ভাতা বৃটেনেই হস্তান্তর করা হত। বৈধ ও অবৈধভাবে সংগৃহীত বৃটিশদের সম্পদের পরিমাণ কোন অংশেই কম ছিল না। তারা অনেকসময় প্রাচ্যের নবাব আখ্যা পেত। এই উপাধি শুধুমাত্র ভারতীয় রীতিতে জীবনযাপন নয়, প্রাচ্যের রাজপু(যদের দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ ও সম্পদ সম্পর্কে বৃটিশদের মনোভাবকেই পরিস্ফুট করত।

এই প্রসঙ্গে এটির উল্লেখ অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ ১৭৬০ সালে যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান তখন তাঁর কাছে ছিল ডাচ কোম্পানীর নামে দুল(ত্রিশহাজার পাউণ্ড, বৃটিশ কোম্পানীর নামে একচল্লিশ হাজার পাউণ্ড, ত্রিশহাজার পাউণ্ডের হীরে, কোম্পানীর কর্মকর্তা হিসেবে সাতহাজার পাউন্ড এবং বম্বেতে কোম্পানীর নামে পাঁচহাজার পাউণ্ড। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর অধস্তন কর্মচারীরাও প্রায় পাঁচহাজার পাউণ্ড পায়। ভারতবর্ষের সম্পদ নিঃশেষ করেই এই অর্থ তারা উপার্জন করেছিল।

বৃটেনে স্থানান্তরিত করা বৃটিশদের অর্থ আসত বিভিন্নভাবে। উদারচেতা ভারতীয় শাসকদের দেওয়া উপঢৌকন ছিল তার একটি গু(ত্বপূর্ণ উৎস। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সালে বাংলায় বৃটিশরা যখন নবাব বদলের খেলায় মেতে উঠেছিল তখন নবাব হতে ইচ্ছুক ভারতীয়রা বৃটিশদের প্রায় কুড়ি ল(টাকা দেয়। বাংলার বার্ষিক রাজস্ব থেকে বৃটিশদের আয় হত ২ কোটি ৫০ ল(টাকা। উপঢৌকন ছাড়াও উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমেও বৃটিশরা নিজেদের আয় বাড়াত। লক্ষ্ণৌতে বৃটিশ কোম্পানীর কাজে নিযুক্ত(অল্পবয়স্ক বালকরাও তিন হাজার বা পাঁচহাজার টাকার ঘুষ বিরক্তি(র সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করত। বাংলার নগরাধ্য(জেমস জনস্টন, বিচার্ড স্মিথ ও স্যার টমাস রামবেণ্ডি যথাত্র(মে রিচার্ড স্মিথ ও স্যার টমাস রামবোল্ড যথাত্র(মে তিনল(, আড়াই ল(, দুই ল(পাউণ্ড নিয়ে অবসরগ্রহণের পর দেশে ফিরে যান।

পূর্ব এশিয়ার মুক্ত(বাণিজ্য চৈনিক মাদকাসক্ত(দের কাছে লোভনীয় ও অনৈতিক মাদক সরবরাহের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই সরবরাহ বন্ধ করার জন্য চীনের বিলম্বিত প্রচেষ্টার ফলে ১৮৪০ সালে যুদ্ধের সূচনা হয় এবং এই যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর বৃটিশরা হংকং দ্বীপ দখল করে নেয়। ঊনবিংশ শতকের শেষে ভারতে আফিম উৎপাদন থেকে ভারত সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব আসায় এবং ওষধি হিসেবে আফিম ব্যবহারের বহুল প্রচলন থাকায় এ(ে ত্রে ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের বিশেষ প্রভাব ছিল না।

বৃটেনে এশীয় বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বৃটিশদের (চির ত্র(মশ পরিবর্তন ঘটে এবং অপরিচিত পণ্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। মরিচ ও মশলা নতুন কোন পণ্য না হলেও কোম্পানীর বাণিজ্য সেগুলিকে সহজলভ্য এবং সস্তা করে তোলে। বৃটেনে প্রথম ভারতীয় বস্ত্রের অত্যাধিক চাহিদা দেখা দেয় এবং পরে চা ও কফি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোম্পানীর ত্র(মাগত সম্পদবৃদ্ধির চিহ্(গুলি লন্ডন শহরে ফুটে উঠতে থাকে। বিভিন্ন নির্মাণের পরিকল্পনায় এই সম্পদের বিনিয়োগ হয়। এর ফলে ভারতীয় ও অন্যান্য এশিয়ার ত্র(মশ বৃটিশ সমাজের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন বন্দরে ভারতীয় ও চৈনিক নাবিকদের কয়েকটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে ফিরে আসা হাজার নাবিকদের মধ্যে কয়েকজন থেকে যায়। কোম্পানীর কার্যকলাপের ফলে প্রাচ্যদেশীয় (চির সৃষ্টি হয়। ১৭৯০ সালে খবরের কাগজে ভারতীয় 'কারি পেষ্ট'-এর বিজ্ঞাপন দেখা যেত। ১৮০০ সালে বাংলায় কোম্পানীর সৈন্যবিভাগের এক প্রাক্ত(ন কর্মচারী দিন মুহম্মদ ওয়েস্ট এন্ডে একটি হিন্দুস্থানী কফির দোকান গড়ে তোলে এবং পরে ব্রাইটনে কেশ পরিচর্যার ব্যবসা শু(করে।

১৮১৩ সালে ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। ১৮৩৩ সালে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের সনদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় কোম্পানী বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে তার অস্তিত্ব হারায়। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের প্রশাসনের দায়িত্বও হারায় কোম্পানী। ভারত বিভাগের কার্যালয়ে কোম্পানীর নথিপত্র স্থানান্তরিত হয় এবং কোম্পানীর সংগ্রহশালায় রাখা বিভিন্ন সামগ্রী ১৮৭০ সালে সাউথ কেনসিংটন সংগ্রহশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। ভারত বিভাগের গ্রন্থাগার এখন বৃটিশ গ্রন্থাগার দ্বারা অধিগৃহীত, যা ট্রেডিং পে-সেস ঃ দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড এশিয়া' নামে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। এশিয়া এবং বৃটেনে জীবনযাপনের পদ্ধতি কোম্পানী কিরকম অদ্ভুতভাবে বদলে দেয়, সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যের নানা সমস্যা, ১৬১৪ সালের ইংরেজী থেকে মালয়ী ভাষায় অনুবাদের জন্য একটি অভিধান, অষ্টাদশ শতকের সূচনায় ইউরোপে আনা রেশমের মত বিলাস দ্রব্য, পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে জটিল আদান-প্রদান এই প্রদর্শনীতে দেখানর ব্যবস্থা হয়।

অষ্টাদশ শতকে ভারতে বৃটিশদের উপস্থিতিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। একটি শতকের মধ্যভাগে শেষ হয় এবং অন্যটি মধ্যভাগ থেকে শু(হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উপকূলের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যের (ে ত্রে বৃটিশদের উপস্থিতি অনুভূত হত। ১৭৫০ সালের পর থেকে পূর্ব ও দ(িণ-পূর্ব ভারতে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং যুদ্ধে সাফল্যের পর রাজনৈতিক (মতা দখলের জন্য বাংলার মত সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে বৃটিশরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। অষ্টাদশ শতকের শেষে বৃটিশ শাসন শক্তি(শালী হয় এবং দিল্লী সহ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দ(িণ ভারতে তাদের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। ওই সময়ের মধ্যে বৃটিশরা এমন একসামরিক আধিপত্য স্থাপন করে যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে অবশিষ্ট ভারতীয় রাজ্যগুলিকে পরাজিত করার (ে ত্রে সহায়ক হয়। বৃটিশরা ওই রাজ্যগুলি জয় করে অথবা তাদের শাসকদের অধীনতামূলক মিত্রতা স্বীকারে বাধ্য করে।

অষ্টাদশ শতকে সূচনায় ভারতে বৃটিশদের বাণিজ্যের একশ বছর পূর্ণ হয়। ১৬০০ সালে গড়ে ওঠার পর থেকে এশিয়ায় বৃটিশ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এর দায়িত্বে ছিল। অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় যার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওলন্দাজদের প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৩০০০ অংশীদার কোম্পানীকে মূলধন হিসেবে প্রায় ৩২ ল(পাউন্ড দেয় এবং স্বল্প মেয়াদী সুদে আরো ৬০ ল(পাউন্ড ধার নেওয়া হয়। এশিয়ায় প্রতিবছর প্রায় ত্রিশটি জাহাজ যেত এবং লণ্ডনে বার্ষিক বেচাকেনা প্রায় ২০ ল(পাউণ্ডে পৌঁছয়। কোম্পানীর মূল কার্যালয় ছিল লণ্ডন শহরে যেখানে অংশীদারদের দ্বারা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্বাচিত কোম্পানীর ২৪ জন পরিচালক সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন।

১৭৫০ সালে শু(হওয়া ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব শেষ হয় ১৭৬৩ সালে, দ(িণ-পূর্ব ভারত ও বাংলায় বৃটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর। ১৭৫৬ সালে স্থানীয় এক শাসক কলকাতায় কোম্পানীর বাণিজ্যকেন্দ্র দখল করলে লর্ড রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী তাঁকে বিতাড়িত করে। পরের বছর পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশদের জয়ের পর তাদের মনোনীত একজন নবাব (মতায় আসেন। বাংলায় প্রাধান্য ত্র(মাগত বৃদ্ধির পর অবশেষে বৃটিশ শাসনের সূচনা হয় ১৭৬৫ সালে যখন সামরিক শক্তি(বিহীন অথচ প্রতীকী মূল্যে গু(ত্বপূর্ণ মুঘল সম্রাট ক্লাইভের হাতে বাংলার শাসনভার তুলে দেন।

ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন থাকে। বৃটেনের জাতীয় দায়িত্ব বলতে বৃটিশ রাষ্ট্রের দ্বারা কোম্পানীর কার্যের নিয়মিত তত্ত্বাবধান এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৃটিশ আইনসভার নেওয়া খোঁজখবরকে বোঝাত। ভারতে কোম্পানীর বিভিন্ন বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কর্মচারীরা প্রাদেশিক শাসনকর্তায় পরিণত হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায়ে নিযুক্ত(থাকলেও বৃটিশদের বিজিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসকের দায়িত্ব পায় কোম্পানীর কর্মচারীরা। কিছু বৃটিশ ও প্রধানত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। কোম্পানীর বিভিন্ন অঞ্চলের নিরাপত্তা র(া, প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যগুলি দখল এবং অভ্যন্তরীণ যেকোন বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য এই সৈন্যবাহিনী ব্যবহার করা হত।

যেসব ভারতীয় রাজ্য কোম্পানী দখল করে তাদের পূর্বের অনুকরণেই কোম্পানীর নতুন সরকার প্রশাসনের স্থাপিত হয় এবং প্রশাসনের অধিকাংশ গু(ত্বপূর্ণ কাজ প্রথমদিকে করত ভারতীয়রাই। সরকারের প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়া হত যা মধ্যবর্তী ভূস্বামীশ্রেণীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছে পৌঁছত। মধ্যবর্তী ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর নিজেদের জন্য ফসলের একটি অংশ রাখার অধিকার ছিল।

তাদের সৈন্য প্রতিপালন এবং বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া ছাড়াও, প্রশাসনকে কৃষকদের এবং ভূ-স্বামী শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়। বৃটিশ বিচারকেরা হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে বিচার হওয়া আদালতগুলিতেও উপস্থিত থাকতেন। সম্পূর্ণ নতুন কিছু উদ্ভাবনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। ওয়ারেন হেস্টিংস, যিনি ১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন, বি(াস করতেন যে ভারতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নতুন বৃটিশ সরকার একটি প্রাচীন সংবিধান পুনস্থাপনের চেষ্টা করবে যেটি অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যদি এটি করা হয় তাহলে বাংলার মত রাজ্যগুলি তাদের পূর্বের গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধি ফিরে পাবে। কিন্তু এই শতকের শেষে চিত্রটি পালটে যেতে থাকে। সাম্প্রতিক বিপর্যয় শুধু নয়, এক মজ্জাগত পশ্চাদপদতায় ভারত নিমজ্জমান বলে অনেকের মনে হয়। ভারতের অগ্রগতির জন্য দৃঢ় অথচ সদাশয় বৈদেশিক শাসনের প্রয়োজন বলে দাবী করা হয়। উন্নতির বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। জমির মালিকানাকে অধিকতর নিরাপত্তা দেবার জন্য সম্পত্তির লেনদেন প্রত্রি(য়ার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসারে আইনগুলিকে বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হয়। বৃটেন ও ভারতের মধ্যে মুক্ত(বাণিজ্যের (ে ত্রে সব বাধা দূর করে ইউরোপের সঙ্গে ত্র(মবর্ধমান বাণিজ্যের সূচনা করা হয়। শি(ার কাঠামোকে নতুনভাবে সাজানো হয়। এশীয় ধর্মগুলির দ্বারা প্রচারিত তথাকথিত অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য খৃস্টধর্মের যুক্তি(বাদ প্রচারে মিশনারীরা উদ্যোগী হন। ভবিষ্যতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উন্নতির পরিকল্পনা করা হলেও ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে ভারত শাসন করার প্রতিশ্রুতি দ্রুত (ীণ হতে থাকে।

১৭৫০ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করা বৃটেন অনুমোদন করে নি এবং জাতীয় সরকার ও কোম্পানীর পরিচালকগণ উভয়েই ছিলেন রাজ্যবিস্তারের বিপ(। কিন্তু এই আশা ব্যর্থ হয়। মুঘল পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোম্পানী রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধ্য হয়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে সম্ভাব্য শত্রুদের প্রতিহত করতে কোম্পানী সচেষ্ট হয়। এই সম্পর্কের ফলে ওই রাজ্যগুলিতে কোম্পানীর হস্ত(েপের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প(নিয়ে কোম্পানী যুদ্ধে যোগ দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে বিভিন্ন প্রান্তরে বহু ব্যয়সাধ্য এবং গু(ত্বহীন যুদ্ধে বৃটিশরা লিপ্ত হয় যা কোম্পানীর অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটায় এবং বৃটেনে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়। শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল রিচার্ড ওয়েলেসলী সীমিত হস্ত(েপের নীতি পরিত্যাগ করে ভারতের প্রতিটি শক্তি(শালী রাজ্যের উপর বৃটিশদের আধিপত্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে এক ত্র(মাগত রক্ত((য়ী যুদ্ধ শু(হয় যা পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমে আফগানিস্তানের পর্বতমালা থেকে পূর্বে বার্মা পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায়।

একক ১৪ ❑ কোম্পানী ও ভারতীয় বণিকরা

গঠন

১৪.১ কোম্পানী ও ভারতীয় বণিকরা ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ভারত কোম্পানীর ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতীয় তাঁতীদের বোনা সূতীবস্ত্র বৃটেন প্রচুর পরিমাণে আমদানী করত বস্ত্র ও আসবাবের আচ্ছাদন তৈরীতে প্রয়োজনীয় সস্তা, হাল্কা কাপড়ের পৃথিবীব্যাপী চাহিদার যোগান দেবার জন্য। বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতায় কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র এমন স্থানে গড়ে ওঠে যেখানে রপ্তানীর জন্য সুতীবস্ত্র সহজলভ্য ছিল। কোম্পানীর কারখানা থেকে এই স্থানগুলি প্রধান বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয় যখন ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কারিগররা কোম্পানীর এবং সেখানকার অধিবাসী বৃটিশদের সঙ্গে ব্যবসার প্রয়োজনে ওই জায়গাগুলিতে বসবাস শু(করে।

ভারতের এক উন্নত অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে বৃটিশ-ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা শু(হয়। বিদেশী বণিকদের জন্য ভারতে মজুত ছিল বস্ত্রবয়নে এবং রেশমবয়নে দ(কারিগরদের কর্মনৈপুণ্য, চিনি, নীলরঙ, আফিম প্রভৃতি রপ্তানীর উপযোগী কৃষিজাত দ্রব্য এবং তেজারতির কার্যে নিযুক্ত(ধনী ব্যক্তি(ও এক শক্তি(শালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। অনুন্ন সপ্তদশ শতক পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের সুদ(শাসনে সমগ্র ভারত জুড়ে নিরাপদে ব্যবসা করার পরিবেশ বজায় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোম্পানীর ভারতীয় ব্যবসা সুস্থির ও লাভজনক হয়ে ওঠে। লণ্ডনে যাঁরা কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করতেন তাঁরা স্থিতাবস্থার পরিবর্তনের জন্য সামরিক ও রাজনৈতিক হস্ত(েপের কোন প্রয়োজন অনুভব করেননি। ১৭৫০ সাল থেকে ব্রিটিশরা ভারতীয় রাজনীতিতে হস্ত(েপ করতে শু(করে এবং ভারতে তাদের ভূমিকায় এক বৈপ্-বিক পরিবর্তন দেখা যায়। ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং স্থানীয় বৃটিশদের ত্র(মবর্ধমান উচ্চাকাঙ(া দ্বারা এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায়।

ভারতবর্ষে পরিস্থিতির অবশ্যই পরিবর্তন ঘটছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল এবং কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তি(র উত্থান ঘটছিল। এর ফলে সাধারণ আশঙ্কা অনুযায়ী অশান্তি ও অরাজকতার পরিবেশের সৃষ্টি হয়নি। কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের শাসন স্থিতিশীল ছিল। সমগ্র ভারত জুড়ে কোন বিশেষ অর্থনৈতিক অব(য় দেখা যায় নি।

কয়েকটি নতুন রাজ্যের মধ্যে অবশ্য সংঘর্ষ দেখা দেয়। উপকূল অঞ্চলের কিছু রাজ্যে (মতালোভী ব্যক্তি(রা তাদের উচ্চাকাঙ(া চরিতার্থ করার জন্য ইউরোপীয়দের সমর্থন আদায় করতে উদ্যোগী হয় এবং এতে ইউরোপীয়রাও অত্যন্ত উৎসাহী ছিল। অংশত তাদের কোম্পানীর প(থেকে তারা কাজ করত। ১৭৪০ সালে বৃটিশ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ে দেরীতে নিযুক্ত(ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে ওঠে। দ(িণ ভারতে মুঘলদের উত্তরাধিকারী আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে নিজস্ব কোম্পানীর জন্য বিভিন্ন অতিরিক্ত(সুবিধা আদায় ও বিরোধীদের দুর্বল করতে বৃটিশ ও ফরাসীরা সচেষ্ট হয়। ব্যক্তি(গত উচ্চাকাঙ(াও এ(েত্রে জড়িত ছিল। সিংহাসনলাভে ভারতীয় শাসকদের সফলভাবে সাহায্য করলে ইউরোপীয় সেনানায়কদের অঢেল পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত। অন্যকে রাজপদে বসানোয় যিনি সিদ্ধহস্ত, সেই রবার্ট ক্লাইভের মত একজন মানুষ অতি সহজেই অত্যন্ত ধনী হয়ে উঠতে পারতেন।

১৯৫০ সালে প্যারিসে প্রকাশিত 'History of the Universe' গ্রন্থে জে পিরীন লিখেছেন যে, সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেও বি(ে এশিয়ার স্থান ইউরোপের তুলনায় গু(ত্বপূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় এশিয়ার ধনসম্পদ

বেশী ছিল। তার শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির সূক্ষ্মতা ও ঐতিহ্য ইউরোপের কুটীরশিল্পের ছিল না। পাশ্চাত্যের দেশগুলির বণিকরা এমন কোন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করত না যাতে এশিয়দের ঈর্ষার উদ্রেক হতে পারে। ঋণ, অর্থের স্থানান্তর, বীমা ও শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানের (ে ত্রে ভারত, পারস্য, অথবা চীনের ইউরোপের কাছে কিছু শেখার প্রয়োজন ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার বাণিজ্যিক ত্রি(য়াকলাপ শু(করে। প্রথমে ইউরোপে সবচেয়ে জনপ্রিয় বৃটিশ দ্রব্য চওড়া কাপড় বিত্র(ীর আশায় ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ভারতে আসে এবং এর অত্যন্ত স্বল্প চাহিদা দেখে হতাশ হয়। পরিবর্তে, পর্তুগীজদের মত তারা কী বৃটেনে লাভের সঙ্গে বিত্র(ী করার মত কিছু ভারতীয় পণ্য খুঁজে পায়। অন্য ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে মিশরের মধ্যে দিয়ে লোহিত সাগরের পথে, ইরাকের মধ্যে দিয়ে পারস্য উপসাগর ধরে এবং তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তরের স্থলপথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ায় বৃটিশ বণিকদের প্রাধান্য স্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না। তাদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সব সুযোগ-সুবিধা চাইতে হত এবং স্থানীয় শাসক ও ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু সংস্থান রেখে বাণিজ্যিক প্রস্তাব পেশ করতে হত। ইউরোপীয় বাণিজ্যের ত্র(মবর্ধমান সুযোগসুবিধা এবং স্থলপথে বাণিজ্য থেকে ত্র(মহ্রাসমান রাজস্বের মধ্যে সম্পর্ক ল(্য করে আওরঙ্গজেব বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ত্রি(য়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হলেও, সব ভারতীয় শাসকের বাণিজ্যিক সুবিধা দানের (ে ত্রে বিশেষ আপত্তি ছিল না। এছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবিধা পাবার জন্য ধৈর্য্য ধরতে, লড়াই করতে, মিনতি করতে প্রস্তুত ছিল এবং ভারতের দীর্ঘ উপকূলের বিভিন্ন স্থানে এইভাবে তারা বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে স(ম হয়েছিল।

এইসময়ে ভারতীয় ও বৃটিশদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উভয় দেশ থেকেই কর্মচারী নিয়োগ করত। বাণিজ্যিক লেনদেনের (ে ত্রে শুধু নয়, বিবাহসূত্রেও দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হত। বৃটিশ ভদ্রসমাজের রীতিনীতির কাঠিন্য থেকে মুক্ত(হয়ে হালকা ও আরামদায়ক ভারতীয় পোষাক পরে, ভারতীয় কায়দায় অবসরজ্ঞাপন এবং নিজেদের ভাষায় স্থানীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কর্মচারীরা ভারতে জীবনকে যথেষ্ট উপভোগ করত। বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিমুক্ত(বৃটিশ বণিকরা ভারতীয় পণ্যের সূক্ষ্ম কা(কার্য দেখে মুগ্ধ হত এবং বৃটেনে ও ফ্রান্সে তাদের ত্র(মবর্ধমান জনপ্রিয়তার সুযোগ নিত। এই ব্যবসা এত লাভজনক ছিল যে ভারত সোনারূপা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করলেও বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধনী হয়ে উঠছিল।

ইংল্যাণ্ডে পৌঁছনর জন্য আফ্রিকা ঘুরে দীর্ঘ পথ যেতে হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশরা বিস্ময়করভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। অন্যান্য কিছু কারণে অবশ্য এই অসুবিধা অনেকটাই দূর করা যেত। প্রথম, আইনগতভাবে একচেটিয়া অধিকার থাকায় বৃটিশ বাজারের উপর তাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনস্থল থেকে সরাসরি কেনায় ইউরোপে প্রবেশ করার পর ভারতীয় পণ্যের অতিরিক্ত(মূল্য বৃদ্ধি থেকে তারা অব্যাহতি পেত। তৃতীয়ত, ভারত মহাসাগরে তাদের জাহাজগুলি আকারে বৃহত্তম হওয়ায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়ার অর্থের সাশ্রয় হত। এছাড়াও আফ্রিকা ও আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের জন্য নতুন বাজার সৃষ্টি করতে তারা স(ম হয়েছিল।

'Europeans and the Textile Trade' (Arts of India 1550-1900) গ্রন্থে ভেরোনিকা মারফি লিখেছেন যে, যদিও আটলান্টিক মহাসাগরে দাস ব্যবসায়ে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি যোগ দেয় নি তবুও তাদের কাছে এটি অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে একসঙ্গে বিচার করলেও আটলান্টিক মহাসাগরের দাস ব্যবসায়ে বৃটিশদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ১৮৫০ সালে 'The Slave Trade, Domestic and Foreign' গ্রন্থে হেনরী কেরী লিখেছেন যে, বৃটিশ দাস ব্যবসা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ ছিল এবং ইংল্যাণ্ড যেসব দেশের উপর প্রাধান্য স্থাপন করত সেসব দেশ থেকে স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হত। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আয়ের একটি গু(ত্বপূর্ণ উৎস ছিল আটলান্টিক মহাসাগরে দাস ব্যবসা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও এমন কী তুরস্কে ভারতীয় পণ্য পুর্নরপ্তানী করছিল। এর ফলে তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিত্রি(য়া দেখা যায় যেহেতু ভারতীয় বাণিজ্য থেকে ওই দেশগুলির রাজস্বের এক বড় অংশ আসত। মুঘলদের রাজস্বের উপরও এর বিশেষ প্রভাব পড়ে এবং আরব ও গুজরাটী বণিকদের ব্যবসা সম্পূর্ণ ধ্বংস না হলেও এই ব্যবসার পরিমাণ ত্র(মশ কমতে থাকে ও এশিয়ার মধ্যে এই ব্যবসা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কেন্দ্রবর্হিমুখী শক্তি(কে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে মুঘল রাষ্ট্র ত্র(মশ ভাঙনের দিকে এগিয়ে চলে। এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি(বাড়ে, কার্যকলাপ বিস্তৃত হয় এবং ভারতীয় শাসকদের কাছ থেকে কোম্পানী অধিকতর সুযোগসুবিধা দাবী করতে থাকে।

যদিও ভারতীয় শাসকরা কোম্পানীকে অধিকতর সুযোগসুবিধা দেন তবুও ইউরোপীয় রৌপ্যমুদ্রা এশিয়ায় চলে আসার বি(দ্ধে আ(ে প দেখা দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের রেশম ও পশম ব্যবসায়ীরা ইউরোপের মধ্যবিত্ত সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে তার বি(দ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের উপর শুধু নিয়ন্ত্রণ নয় তারা নিজেদের দেশে ভারতীয় পণ্য বিত্র(য়ের উপরও নিষেধাজ্ঞা দাবী করে। এই নিষেধাজ্ঞা যদিও ভারতীয় পণ্যের চোরাচালান বন্ধ করতে পারে নি তবুও এতে ভারতীয় বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে মুঘল সাম্রাজ্য থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক রাজ্যগুলির রাজস্ব (তিগ্রস্ত হয় এবং বাংলা প্রথম এর কুফল ভোগ করে।

ভারতীয় বস্ত্রের বাণিজ্য থেকে লাভের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। ১৬১৬ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত স্যার টমাস রো মুঘলদের কাছে ঘোষণা করেন যে বাণিজ্য ও যুদ্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৬৬৯ সালে, বস্ত্রব্যবসায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর পূর্বে, বম্বেতে কারখানার প্রধান জেরাল্ড আঙ্গিয়ার পরিচালকদের বাণিজ্য পরিচালনার (ে ত্রে সামরিক শক্তি(ব্যবহারের পরামর্শ দেন। ১৬৮৭ সালে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ভারতে গোয়ার মত এক বৃটিশ উপনিবেশ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। ফরাসী গভর্ণর ডুপে-রও একই মত ছিল। অগস্ট তুঁসের 'History of the Indian Ocean' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৬১৪ সালে ওলন্দাজ জাঁ পিটারজুন কোয়েন অস্ত্রের সাহায্যে ভারতে বাণিজ্য পরিচালনার প্রস্তাব দেন পরিচালকদের। অষ্টাদশ শতাব্দীর আফিমের বাণিজ্য (যার ফলে অহিফেন যুদ্ধ হয়) যাতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থর(ায় বৃটিশ নৌবাহিনী সচেষ্ট হয়, সেটিই হল যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্যের সম্পর্কের এক উদাহরণ। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিচারে ঔপনিবেশিকতা অবশ্যই ছিল এর পরবর্তী পদ(ে প। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের পরিবর্তনের এক বিপজ্জনক সত্ত্বেও ছিল পলাশীর যুদ্ধ।

ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থকরা এশিয়দের দুর্বল চরিত্র এবং নিজেদের শাসন করার (ে ত্রে ভারতীয়দের অ(মতার উল্লেখ করলেও 'Rise and Fall of the East India Company' গ্রন্থে আর. কে. মুখার্জী সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্ত(ব্য অনুসারে অর্থনৈতিক প্রয়োজনই ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের পথে নিয়ে যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন যে একচেটিয়া অধিকার ত্র(য়বিত্র(য়ের (ে ত্রে থাকলেও এটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সস্তায় পণ্য কেনার সুযোগ দেয় নি। সেজন্য রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল অবশ্য প্রয়োজন।

ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর একটি দ্বিতীয় সমস্যা ছিল লাভের (ে ত্রে অন্য বৃটিশ কোম্পানীগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা। লাভের উদ্দেশ্য যখন সবচেয়ে গু(ত্বপূর্ণ ছিল, তখন পলাশীর যুদ্ধ ও অহিফেন যুদ্ধকে তৎকালীন পরিস্থিতির যুক্তি(সঙ্গ ত পরিণতি বলা চলে কারণ বৈধ ও সম্মানজনক উপায়ে মুনাফা করে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু কয়েকজন ঐতিহাসিকদের দাবী অনুসারে, বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি "ভদ্র ব্যবসায়ীদের" নিয়ে গঠিত হত তাহলে বস্ত্র ও চায়ের ব্যবসা থেকে আফিমের মত মাদকের ব্যবসায় চলে যাওয়া তাদের প(ে সম্ভব হত না। যদি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হতেন, তাহলে (তি স্বীকার করে তারা দেউলিয়া হয়ে যেতেও রাজী হতেন।

এটি আরো গু(ত্বপূর্ণ যে আফিমের ব্যবসায়ে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচুর লাভ করলেও তারা যুদ্ধের পথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। একবার (মতার স্বাদ পাবার পর তারা বারবার শক্তি(প্রয়োগ করতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যথেষ্ট পরিমাণে আফিম উৎপাদনে ভারতীয় কৃষকদের বাধ্য করে এবং এভাবে বৃটিশ-বাজারের জন্য প্রচুর চা সংগ্রহের পর প্রচুর লাভ করে। তবুও এশিয়ায় বাণিজ্যে নিযুক্ত(ভারতীয় ও অন্যান্য এশিয় জাহাজের উপর সামরিক আত্র(মণ শু(করে কোম্পানী। করমণ্ডল উপকূলের শাসকগণ ও মারাঠারা, যাদের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ কমতে থাকে, এই আত্র(মণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ভিত্তিভূমি রচনা করে। যদিও বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ে(ত্রে পলাশীর যুদ্ধ ছিল অস্তিত্ব র(ার লড়াই, পরবর্তী যুদ্ধগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত(করা যায় না। কিছু ঐতিহাসিকের মতে ফরাসীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দ(ণ ভারতে যুদ্ধের সূচনা করে। কিন্তু এক ফরাসী বিশেষজ্ঞই এই মতের বিরোধিতা করেছেন।

'Les Jrois Ages des Colonies, Paris, 1902' গ্রন্থে Abbe de Pradt লিখেছেন যে, পলাশীতে বিজয় এবং সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার পর ইংলণ্ড সমগ্র ইউরোপে দেখায় যে আমেরিকা থেকে সংগৃহীত মূল্যবান ধাতু ভারতে পাঠানর তার আর কোন প্রয়োজন নেই। প্রজাদের থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব ও পণ্যের উপর ধার্য শুল্কের সাহায্যে বৃটিশরা ব্যবসা করতে পারত, যেখানে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে ধাতুর মুদ্রা ব্যবহার করতে হওয়ায় তাদের ব্যবসায় (তি হত। ভারতে বৃটিশদের সার্বভৌম (মতা প্রতিষ্ঠার পর ইউরোপ থেকে ভারতে মূলধন পাঠান বন্ধ হয়ে যায়। Abbe de Pradt নির্দিষ্টভাবে লিখেছেন যে, ইউরোপ থেকে ধাতুমুদ্রা এশিয়ায় পাঠান উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর মত ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃটিশদের ছিল যাতে ইউরোপও যথেষ্ট লাভবান হয়। এই সাম্রাজ্য যতটা বেশী বৃটিশ তার চেয়ে বেশী ইউরোপীয় ছিল। এই সাম্রাজ্যের বিস্তারে ইউরোপের সুবিধা হয় এবং ব্রিটিশদের জয় ইউরোপেরই জয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় বিরোধীদের ভর্ৎসনা ব্রিটিশ কতৃত্বের বি(দ্ধে প্রতিবাদ এক বিকারগ্রস্ত আর্তনাদ এবং তিনি বলেন যে, ভারতের উপর তারা প্রকৃতপ(ইউরোপ-বিরোধী করে।

প্রকৃতপ(এই মত পরবর্তীকালের বহু বি(ে-ষকের পর্যবে(ণের সঙ্গে মিলে যায় যাঁরা মনে করেন যে সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দেশগুলির প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ হ্রাস পায় এবং পলাশীর যুদ্ধের পর তা আরো কমে যেতে থাকে। মোদ্দাকথা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতায় বৃটিশদের জয় হয়। Abbe de Pradt এর মতে বৃটিশদের কাছে হারান কিছু বিশেষ সুবিধার জন্য আ(প না করে ফরাসীদের সূচিত এই জয়ের সামগ্রিক সুফল ভোগ করা।

'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ এন. কে. সিংহ লিখেছেন যে প্রায় দুশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ইউরোপীয়রা দেখে যে কোম্পানী, অথবা স্বাধীন বণিকদের ব্যক্তি(গত বা অবৈধ ব্যবসা দুই-ই সবসময়েই বাংলার প(সুবিধাজনক থাকায় ইউরোপ থেকে ধাতুমুদ্রা সরবরাহ করতে হত। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার জনগণের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা রাজস্বের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে এভাবে বাণিজ্য ছাড়াই অন্যভাবে বাংলায় মূলধন পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মতে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়াছল। আর্মেনীয়, মুঘল, গুজরাটী এবং বাঙালী ব্যবসায়ীদের স্বাধীন ব্যবসা ত্র(মশ হ্রাস পাচ্ছিল। রপ্তানী, আমদানী, পণ্য উৎপাদন স্বাধীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাড়া করা মধ্যবর্তী বণিকদের হাতে চলে গিয়েছিল। এর ফলে অনেক ে(ত্রেই শক্তি(প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিযোগী ভারতীয় বণিকদের কারখানা ধ্বংস করার জন্য কোম্পানীর সৈন্যদের পাঠান হত। যেসব স্বাধীন তাঁতী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়া স্বল্প বেতনের বিনিময়ে কাপড় বোনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত। তাদের হাত কেটে দেওয়া হত। পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থলপথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপরও তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। পলাশীর যুদ্ধের ত্রিশ বছরের মধ্যে পূর্ব ভারতের

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক নাগপাশে আবদ্ধ করে ফেলে।

Abbe de Pradt-এর দেওয়া পূর্বাভাস অনুসারে ঔপনিবেশিকতার সুবিধা শুধুমাত্র বৃটিশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারের সুবিধা গ্রহণ করতে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার বণিকরাও উদ্যোগী হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থার অবনতির সুযোগ নিয়ে তারা অল্প দামে ভারতীয় পণ্য কিনে নেবার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারীরা অন্যায্যভাবে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতারণা ও লুঠপাঠ শু(করে। বেআইনীভাবে সংগৃহীত এই সম্পদ ভারত থেকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ও শুল্ক এড়ানোর জন্য তারা ফরাসী ও ওলন্দাজদের সাহায্য নিত। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় প্রতিযোগীরা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বছর ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

মার্কিন ঐতিহাসিক ফার্বার ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে ১৭৬৯ এবং ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রতিযোগীরা সক্রি(য় ছিল। তাঁর বক্ত(ব্য অনুসারে এটি ছিল একটি প্রতিষ্ঠান। কোম্পানীর মূলধন ৩২ ল(পাউণ্ডের এক পঞ্চমাংশ ছিল ওলন্দাজদের নিয়ন্ত্রণে এবং আমস্টারডাম, প্যারিস, কোপেনহেগেন, লিসবনের বিনিয়োগকারীরা, যারা কোম্পানীর ক্রি(য়াকলাপের সঙ্গে প্রত্য(ভাবে জড়িত ছিল, তারা মূলধনের এক বৃহৎ অংশ বিনিয়োগ করত। ফার্বারের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যাবলী প্রমাণ করে যে স্বদেশে বা বিদেশে থাকা সমস্ত ইউরোপীয় তাদের (মতা বজায় রাখতে ভারতে একটি বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলার কাছে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহুজাতিক চরিত্র নয়, কোম্পানীর আন্তর্জাতিক পরিচালকবর্গের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের উপরও ফার্বার গু(ত্ব আরোপ করেছেন।

এভাবে পলাশীর যুদ্ধ ছিল কোম্পানীর কয়েকটি আক্র(মণের মধ্যে প্রথম যেগুলি ভারতের কোন আঞ্চলিক শক্তি(ই সফলভাবে প্রতিহত করতে পারে নি। ঐক্যবদ্ধ ভারত ইউরোপের বি(দ্ধে প্রতিরোধে স(ম হলেও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপকে প্রতিহত করার (মতা বিচ্ছিন্ন ভারতের ছিল না। ১৮১৮ সালে মারাঠাদের, ১৮৪৮ সালে শিখদের পরাজয় এবং ১৮৫৬ সালে অযোধ্যা দখলের মধ্যে দিয়ে ভারতে কোম্পানীর সাম্রাজ্যবিস্তার চলতে থাকে। ১৮৫৭ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বি(দ্ধে বিদ্রোহ শু(হলেও এর ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারত বৃটিশদের উপনিবেশে পরিণত হয় এবং ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণের শু(হয়। বৃটিশ আধিপত্যের বি(দ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চললেও ১৯৪৭ সালে আগে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি।

এভাবে প্রায় ২০০ বছর ধরে ভারত থেকে ইউরোপে সুপরিকল্পিতভাবে সম্পদ নির্গমন হতে থাকে। এতে প্রধানতঃ বৃটেন লাভবান হলেও ইউরোপ ও আমেরিকায় বৃটেনের সহযোগীদেরও যথেষ্ট লাভ হয়। ভারতীয় মূলধন ব্যবহার করে বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলি আমেরিকা, জার্মানী ও ইউরোপের অন্য অংশে শিল্প গড়ে তোলে। ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপনের উপর ভিত্তি করে শিল্পবিপ্-ব এবং আধুনিক ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ঘটে। উপনিবেশ দেশগুলির দারিদ্র্য বৃটেন ও আমেরিকার আধুনিকতা ও শিল্পবিকাশের সহায়ক হয়। আধুনিক ধনতন্ত্রের যে কোন গু(ত্বপূর্ণ বি(-ষণে এটি মনে রাখা উচিত।

একক ১৫ ❑ পলাশী যুদ্ধের পটভূমি

গঠন

১৫.০ বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিরোধ এবং পলাশী যুদ্ধের পটভূমি
১৫.১ অনুশীলনী
১৫.২ গ্রন্থপঞ্জী

১৫.০ বাংলার নবাবদের সঙ্গে বিরোধ এবং পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি ঃ কর্ণাটের ঘটনাবলী

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলার নবাবদের সঙ্গে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ একটি অতি গু(ত্বপূর্ণ অধ্যায়কে সূচিত করে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি উত্তরণের সূচনা করে। শুধুমাত্র একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির (ে ত্রে নয়, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের (ে ত্রেও এই সময়টির গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই বিরোধের ইতিহাস এক অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং একটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। 'পলাশীর ষড়যন্ত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে রজত কান্ত রায়ের বই প্রকাশিত হওয়ায় এই বিতর্কে কিছু নতুন মোড় দেখা দেয়। আলোচনা শু(করার জন্য আমরা সেই সময়ের সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

১৭০৫ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁ বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবেদার নিযুক্ত(হন। ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফা(কশিয়ারের দেওয়া ফর্মান অনুসারে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করা, কলকাতার পাশে ৩৯টি গ্রাম কেনা এবং কোলকাতা ও তার পা(র্বেতী গ্রামগুলিতে জমিদারী স্থাপনের অধিকারও পায় বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় দস্তক দেবার অধিকারও পায় কোম্পানী। নবাব আলীবর্দী খাঁ কোম্পানীর উপর কয়েকবার যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব ধার্য করেন এবং পরিবহনের সময় কোম্পানীর পণ্য আটক করে তাদের রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। পণ্যসামগ্রী প্রকৃতপ(ে কোম্পানীর নিজস্ব, বাংলা থেকে কোম্পানীকে বিনা শুল্কে রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনার অনুমতি দেন বাংলার নবাবরা। দ্বিতীয়ত কোম্পানীর ও তার কর্মচারীদের বিনা শুল্কে বাংলার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা চালান নিষিদ্ধ করেন তাঁরা। ১৭১৭ সালের ফর্মান ও দস্তকের অপব্যবহার করত কোম্পানীর কর্মচারীরা। দস্তকের সাহায্যে তারা বিনাশুল্কে ব্যক্তি(গত ব্যবসা চালাত এবং বাংলার নবাবকে তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করত। দস্তকের এই অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হলেও কোম্পানীকে তোষণ করার জন্য আলীবর্দী খাঁ এটি উপে(া করেন। মৌমাছিদের সঙ্গে ইংরেজদের তুলনা করে তিনি বলেন যে, ইংরেজদের সন্তুষ্ট রাখলে তারা মধু দেবে কিন্তু বিরক্ত(করলে তারা হুল ফোটাবে। এই মন্তব্য বৃটিশদের সম্পর্কে বাংলার নবাবদের মানসিকতার পরিচয় দেয়।

১৭৫৬ সালে আলীবর্দীর দৌহিত্র সিরাজদৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। দ(ি ণ ভারতের আর্কটে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তি(কে সিংহাসনে বসানোর পর বাংলাতেও কোম্পানী একই নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিল। ওরমের বক্ত(ব্য অনুসারে আলীবর্দীর শাসনকালে মাদ্রাজে এই পরিকল্পনা করা হয়। বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর, অনভিজ্ঞ, উ গ্রমস্তিস্ক ত(ণ নবাব কোম্পানীর আত্র(মণাত্মক কৌশলের ল(্য হয়ে দাঁড়ান। ত(ণ নবাবের সিংহাসন লাভের বি(দ্ধে সিরাজের মাসী ঘষেটি বেগমের বিদ্রোহ কোম্পানীকে সন্তুষ্ট করে। আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে নতুন নবাবকে নজরানা না পাঠিয়ে কোম্পানী নবাবের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত বিরোধের নীতি গ্রহণ করে সিরাজ। সিরাজ তৎ(ণাৎ ঘষেটির ষড়যন্ত্র দমন করেন এবং তাকে মতিঝিল প্রাসাদে অন্তরীণ করে রাখেন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইংরেজরা

কলকাতা কাউন্সিলের সভাপতির অসুস্থতার অজুহাত দেয় হিসাবে তাদের উপঢৌকন না পাঠানোর কারণ হিসেবে। সিরাজের সন্দেহ হয় যে ঘষেটি বেগমের বিদ্রোহের পেছনে ইংরেজদের হাত থাকতে পারে।

ঢাকার সহকারী দেওয়ান রাজবল্লভ ঘষেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যিনি যুক্ত(ছিলেন তাঁকে হিসেব ও বাকী থাকা টাকা নিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজসভায় উপস্থিত হবার আদেশ দেন নবাব। ছেলে কৃষ(বল্লভের দায়িত্বে নিজের পরিবার ও সঞ্চিত সম্পদ কলকাতায় ইংরেজদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন রাজবল্লভ। তিনি ব্যক্তি(গতভাবে মুর্শিদাবাদের রাজসভায় উপস্থিত হন। প্রচুর উপঢৌকন পাবার পর কলকাতার গভর্ণর ড্রেক কৃষ(বল্লভ ও তাঁর পরিবারকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে রাজী হয়। কৃষ(বল্লভকে প্রত্যর্পণের জন্য সিরাজ ড্রেককে বারবার অনুরোধ করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কৃষ(বল্লভকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার অধিকার কোম্পানীর আছে এই অজুহাতে ড্রেক সিরাজের দাবী প্রত্যাখ্যান করে। নবাব সঠিকভাবেই উল্লেখ করেন যে মুঘল ফর্মান অনুযায়ী কোম্পানী মুঘল সম্রাটের অধীনে কলকাতার জমিদার। মুঘল আইন অনুসারে কোন জমিদারের কোন আসামীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার অধিকার নেই। নবাবের যুক্তি(কলকাতা কাউন্সিল মানতে অস্বীকার করে।

এইসময়ে সিরাজ খবর পান যে কোম্পানী কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে তাঁর অনুমতি ছাড়াই পুনর্নির্মাণ শু(করেছে। নবাবের চিঠির উত্তর দেবার সময় ড্রেক কোন নতুন নির্মাণের কথা অস্বীকার করেন। পরে তিনি যুক্তি(দেখান যে ফরাসীদের সম্ভাব্য আত্র(মণের বি(দ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে নিরাপত্তার জন্য কোম্পানী নির্মাণ শু(করে। এই যুক্তি(অস্বীকার করে নবাব কোম্পানীকে নির্মাণ বন্ধের আদেশ দেন। নির্মাণের পরিস্থিতি পর্যবে(ণ এবং কোম্পানীর সঙ্গে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সিরাজ তাঁর ব্যক্তি(গত সচিব নারায়ণ দাসকে কলকাতায় পাঠান। গুপ্তচর হিসেবে গভর্ণর ড্রেক নবাবের দূত নারায়ণ দাসকে হেনস্থা ও অপমানের পর কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দেন। এতে নবাব অত্যন্ত (ুব্ধ হন। ব্যক্তি(গত দূতের অপমানের উপযুক্ত(ব্যবস্থা নিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন।

রাজনৈতিক প্র(্ন ছাড়া অর্থনৈতিক প্র(্নেও কোম্পানী ও নবাবের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত(করে তোলে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের প্রচলিত আইন অনুসারে কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার উপর গু(ত্ব দেন সিরাজ। অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের যোগ দেওয়া এবং বিনাশুল্কে ব্যক্তি(গত ব্যবসার (ে ত্রে কোম্পানীর কর্মচারীদের দ্বারা দস্তকের অপব্যবহারের তিনি বিরোধিতা করেন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিল নবাবের আপত্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। বাংলার অন্য স্থান থেকে আসা পণ্য কলকাতায় প্রবেশের (ে ত্রে কোম্পানী অধিক হারে শুল্ক দাবী করতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ব্যক্তি(গত ব্যবসা এতটাই বেড়ে যায় যে বাংলার বাণিজ্যের ৩৪.৩% চলে যায় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারে। এইসব পণ্যের উপর ন্যায্য শুল্ক আদায়ের অধিকার থেকে নবাব বঞ্চিত হন।

সিরাজ উপলব্ধি করেন যে কোম্পানী তাঁর রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করছে। অবৈধ দুর্গ নির্মাণ, কৃষ(বল্লভকে আশ্রয় দেন, বিনা শুল্কে অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এই ল(্যপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ(প ছিল। কোম্পানীর (মতাবৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়া হলে দ(িণ ভারতের আর্কটের মত বাংলাকেও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলে পরিণত করার সম্ভাবনা ছিল। নবাব বহু চিঠি লেখা সত্ত্বেও উদ্ধত কলকাতা কাউন্সিল নবাবের চিঠির কোন উত্তর দেয় নি। সেজন্য শক্তি(প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় তাঁর ছিল না।

সিরাজকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সমালোচনা করেছেন বহু ঐতিহাসিক। কোম্পানীর সঙ্গে বিরোধের জন্য এস.সি. হিল সিরাজকে দোষী করেছেন। তাঁর মতে সিরাজের ঔদ্ধত্য ও লোভ সংঘর্ষের জন্য দায়ী ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কারকে একটি সাম্মানিক বিষয় হিসেবে তিনি গণ্য করেছেন। কোম্পানীর সম্পদের লোভে সিরাজ কলকাতা আত্র(মণ করেন। হিলের মত ড. বি গুপ্ত অস্বীকার করেছেন। বাস্তব(ে ত্রে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও দ(িণ ভারতে রাজনৈতিক (মতা দখল কোম্পানীকে আত্র(মণাত্মক ও সাম্রাজ্যবাদী করে তোলে। বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য আর্কটের মত বাংলার সিংহাসনে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তি(কে বসাতে উদ্যোগী হন কোম্পানী। সিরাজ কোম্পানীর

ক্রীড়নকে পরিণত হতে রাজী না হলে এবং নিজের কর্তৃত্ব প্রদর্শন করলে কোম্পানী তাঁকে (মতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষ(বল্লভ, দুর্গনির্মাণ এবং দস্তকের প্র্নে নবাবের ন্যায্য দাবী ইচ্ছে করেই কোম্পানী প্রত্যাখ্যান করে। প্রকৃতপ(আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বিনাশুল্কে ব্যত্তি(গত মত অর্থনৈতিক বিষয় এই বিরোধের মুখ্য কারণ ছিল।

কলকাতা কাউন্সিলকে তাদের নীতির পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ১৭৫৬ সালে নবাব কাশিমবাজার কুঠি দখল করেন। এরপর ১৭৫৬ সালের ২০শে জুন তিনি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয় করেন। দুর্গের নাম পরিবর্তন করে তিনি আলীনগর দুর্গ নাম রাখেন। গভর্ণর ড্রেক এবং অধিকাংশ বৃটিশ নরনারী দ(ণে পালিয়ে গিয়ে ফলতায় আশ্রয় নেন। নবাব ১৪৬ জন বৃটিশকে বন্দী করে একটি ঘরে আটকে রাখেন। ঘরটি ছোট এবং বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় কয়েকজন ইংরেজের মৃত্যু হয়। অন্ধকূপ হত্যা নামে এই দুর্ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজের বি(দ্ধে এই অভিযোগ হলওয়েলের কল্পনাপ্রসূত। নবাব এই ঘটনার জন্য ব্যত্তি(গতভাবে দায়ী ছিলেন না।

কলকাতায় বিপর্যয়ের এই খবর মাদ্রাজে পৌঁছলে গভর্ণর সন্ডার্স কলকাতা উদ্ধার করতে এবং সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে নিজেদের মনোনীত ব্যত্তি(কে সিংহাসনে বসাতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন। এই পরিকল্পনা সফল করতে লর্ড ক্লাইভ ও নৌবাহিনীর প্রধান ওয়াটসনকে সৈন্যদলসহ কলকাতায় তিনি পাঠান। নবাবের সেনানায়ক মাণিকচাঁদকে ঘুষ দেবার মাধ্যমে ক্লাইভ কোন বিরোধিতা ছাড়াই কলকাতা পুনর্দখল করেন। তিনি নবাবের হুগলী বন্দর ধ্বংস করেন এবং কলকাতায় ইংরেজদের আত্র(মণের জন্য দ্বিতীয়বার (তিপূরণ দিতে নবাবকে বাধ্য করেন। নবাবের অধিকাংশ সেনাধ(্য ও সভাসদরা ইংরেজদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে শহর আত্র(মণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন নবাব। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভের সঙ্গে স্বা(রিত আলীনগরের সন্ধির অপমানজনক শর্ত অনুসারে নবাব কোম্পানীর স্বাধীন, সার্বভৌম (মতা এবং কলকাতায় কোম্পানীর দুর্গ নির্মাণ করার অধিকার মেনে নেন।

অলীনগরের সন্ধিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নেবার মানসিকতা ক্লাইভের ছিল না। বৃটিশদের বি(দ্ধে নবাব ও চন্দননগরের ফরাসীদের একত্রিত হওয়াকে ঠেকানোর জন্য ক্লাইভ এই সন্ধি স্বা(র করেন। সিরাজ নিজের রাজধানীতে ফিরে যাবার পর ক্লাইভ চন্দননগর আত্র(মণ ও দখল করেন। ফরাসী সৈনাধ(্য এম ল এবং অন্য ফরাসীরা পালিয়ে গিয়ে নবাবের রাজসভায় আশ্রয় নেন। নবাবের প্রধান সেনাধ(্য মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে এক গোপন চুত্তি(করেন যাতে ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন এবং এর বিনিময়ে নবারের উপর ক্লাইভের আত্র(মণের সময়ে মীরজাফর নবাবের সৈন্যবাহিনীকে নিষ্ি(য় রাখতে স্বীকৃত হন। ক্লাইভ ও কলকাতা কাউন্সিলের অন্য সদস্যদের প্রচুর উপঢৌকন দেবার আশ্বাস দেন তিনি।

এই ষড়যন্ত্রের পর ক্লাইভ আলীনগরের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার অভিযোগে নবাবকে আত্র(মণ করেন। গঙ্গার তীরে পলাশীতে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব কোম্পানীকে প্রতিহত করার উদ্যত হন। সংঘর্ষের পর তাঁর প্রধান সেনানায়ক মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নবাব পলাশীর যুদ্ধ(ত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সিরাজকে বন্দী করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। মীরজাফর বাংলার সিংহাসনে বসেন।

'পলাশীর যুদ্ধ' গ্রন্থে কবি নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর পরাজয়ের পর ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হবার চিত্র অঙ্কন করেছেন। পলাশীর পরাজয়ের পর বাংলার নবাবের স্বাধীন অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এরপর বাংলার নবাবরা কোম্পানীর ক্রীড়নকে পরিণত হন। বাংলার আইনগত শাসক মীরজাফর হলেও কোম্পানী প্রকৃত শাসকের ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজত্বের শেষদিকে বৃটিশদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন মীরকাশিম। যদি বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের বি(দ্ধে কোম্পানী ব্যর্থ হত, তবে বাংলার ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা হতে পারত। দেশীয় শাসকদের বি(দ্ধে বৃটিশদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেনি পলাশীর যুদ্ধ। স্যার যদুনাথ সরকার উল্লেখ করেছেন

যে সীমিত প্রভাব সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধ প্রমাণ করে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য সংঘর্ষে পরাজিত করতে পারে। পলাশীর জয়ের ফলে ইংরেজদের সামরিক খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

এই জয়ের ফলে বাংলায় কোম্পানী সিংহাসনের পেছনে প্রকৃত শক্তি(তে পরিণত হয়। নৌশক্তি(র দ্বারা এই উপকূলবর্তী প্রদেশে তারা প্রাধান্য স্থাপন করে। ত্র(মশ উত্তর ভারতে তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করে। বাংলা থেকে সংগ্রহ করা সম্পদের উপর ভিত্তি করে কোম্পানী একটি বড় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলে যা তারা ফরাসীদের এবং অন্যান্য দেশীয় শক্তি(র বি(দ্ধে ব্যবহারের পর ভারতের অধী(রে পরিণত হয়। পি. জে. মার্শালের মতে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারত থেকে বৃটেনে সম্পদ নির্গমন শু(হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মার্শাল যুক্তি(দেখিয়েছেন যে বৃটিশরা শুধুমাত্র বাংলাকে বিশৃঙ্খলতা মুক্ত(করে সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করে।

দ(িণ ভারতে কর্ণাটকের ঘটনাবলীর মধ্যেবৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার চরম পরিণতি ল(্য করা যায়। ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী স্বাভাবিকভাবে ছিল পরস্পরের শত্রু। ভারতে অন্য দলকে বঞ্চিত করে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দখল ইংরেজ ও ফরাসী উভয়েরই ল(্য ছিল। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে মার্কেন্টাইল মতবাদের উন্মেষের পর বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার দখলের মনোভাব দেখা দেয়। মার্কেন্টাইল নীতি অনুসারে সমৃদ্ধিশালী হতে গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর একটি দেশের একচেটিয়া অধিকার দখল এবং অন্য দেশকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভারতে মুঘল সম্রাট দেশীয় বণিকদের রপ্তানী বাণিজ্যকে র(া করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে বিদেশী বণিকদের সুবিধা হয়। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ ভারতবর্ষের পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তোলে। পন্ডিচেরীর ফরাসী গভর্ণর যোশেফ ডুপে-র মধ্যে প্রথম ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চাকাঙ(া দেখা দেয়। তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইংরেজরাও ভারতে সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতে ১৭৭০ সালে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ শু(হয়। এসময়ে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। নবাব আনোয়ারউদ্দিনের শাসিত আর্কট রাজ্যে বৃটিশ বন্দর মাদ্রাজ ও ফরাসী বন্দর পন্ডিচেরী অবস্থিত ছিল। বৃদ্ধ নবাবের অনুমতি না নিয়েই পন্ডিচেরীর গভর্ণর ডুপে-ফরাসী সৈন্য পাঠিয়ে মাদ্রাজ দখল করেন। ত্রু(দ্ধ নবাব মাদ্রাজ থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু সেন্ট থোমে অল্প কয়েকজন ফরাসী সৈন্য নবাবের সৈন্যদলকে পরাজিত করে। ১৭৪৮ সালে আই-লা-চ্যাপের সন্ধির মাধ্যমে ইউরোপে বৃটিশ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হলে ভারতেও তাদের সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই সন্ধির মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রথম কর্ণাটের যুদ্ধ সমাপ্ত হলেও অশান্তি চলতেই থাকে। ডুপে-আর্কটের সিংহাসন থেকে আনোয়ারউদ্দিনকে পদচ্যুত করে সিংহাসনে। চাঁদ সাহেব বা হুসেন দোস্ত খান, যাঁরা সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন, তাঁদের সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করেন। আওরঙ্গাবাদের যুদ্ধে আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও হত্যা করার পর চাঁদা সাহেবকে সিংহাসনে বসায় ডুপে-র সৈন্যবাহিনী। এভাবে দ(িণ ভারতে ফরাসীরা একচেটিয়া অধিকার লাভ করে।

ফরাসী একচেটিয়া অধিকার স্থাপন বৃটিশ কোম্পানীর স্বার্থ (ুন্ন করে। মুহম্মদ আলীকে সাহায্যের জন্য ত্রিচিনোপল্লীতে বৃটিশরা একটি শক্তি(শালী সৈন্যবাহিনী পাঠায়। ত্রিচিনোপল্লী দুর্গ অবরোধের সময়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে চরম (তিগ্রস্থ হন ডুপে-। কিন্তু কর্ণেল ক্লাইভের বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনায় ইংরেজদের হাতে চাঁদা সাহেব বন্দী হন। এতে দ(িণ ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ১৭৫৪ সালে মুহম্মদ আলী আর্কটের নবাব হন। ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ফরাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে বৃটিশ-কোম্পানী বিজয়ী হয়।

এই সময়ে ইউরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধের সূচনা হলে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফরাসীরা বৃটিশ বন্দর মাদ্রাজ আত্র(মণ করলে ইংরেজরা এই আত্র(মণ প্রতিহত করে। ইংরেজরা ফরাসী শহর পন্ডিচেরী দখল করে। বাংলায়

ক্লাইভ ফরাসী বাণিজ্যকেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করেন। অবশেষে নন্দীবাসের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতি আয়ারকূট ফরাসীদের হারিয়ে দেন। এসময়ে প্যারিসের সন্ধির মাধ্যমে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ শেষ হলে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের ফরাসী উচ্চাকাঙ্(া ব্যর্থ হয়। কর্ণাটের ঘটনাবলীর মাধ্যমে ভারতীয় বাণিজ্যে বৃটিশ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং কোম্পানী ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়।

বাংলা ও কর্ণাটের ঘটনাবলী ভারতের রাজনীতিতে বৃটিশদের চালিকাশক্তি(তে পরিণত করে। এইসময়ের ভারতীয়দের মানসিকতার বি(েষণ করলে এটি একটি জটিল কাহিনী। ডঃ রজত রায় কোম্পানীর সঙ্গে অভিজাতদের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। সম্পর্কের এই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের সাহায্যেই কোম্পানী ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। দ(ণ ও পূর্ব ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনা করে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতেও আমূল রূপান্তর এনে দেয়। এই পরিবর্তনগুলি বি(েষণের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন জটিলতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১৫.১ অনুশীলনী

১. তুমি কি মনে কর অষ্টাদশ শতকে ভারতে ইংরেজদের উপস্থিতি প্রকৃতপ(বাণিজ্যিক স্বার্থপ্রণোদিত ছিল? তোমার যুক্তি(র স্বপ(প্রমাণ দেখাও।

২. অষ্টাদশ শতকে মার্কেন্টাইল নীতির দ্বারা প্রভাবিত ইউরোপীয় অর্থনীতি ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কী প্রভাব ফেলে?

৩. অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা বি(েষণ কর। ইউরোপীয় বণিকদের সুযোগ করে দেবার মত কি তা দুর্বল ছিল?

৪. অষ্টাদশ শতকে কীভাবে ভারতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাধান্য স্থাপন করে তার বর্ণনা কর। এটি কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?

৫. ভারতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ত্রি(য়াকলাপকে শুধুমাত্র মার্কেন্টাইল নীতির প্রয়োগ আখ্যা দেওয়া যায় কি? কিভাবে বণিকদের ব্যক্তি(গত স্বার্থ একটি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

৬. বাংলার নবাব ও বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও। তুমি কি মনে কর যে অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জন্যই কোম্পানী যুদ্ধে জয়লাভ ধরার ও বাংলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়?

৭. তোমার কি ধারণা যে বাংলার রাজনীতির আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা বৃটিশ কোম্পানীকে বাংলায় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ দেয়? স্বপ(প্রমাণ দেখাও।

৮. কীভাবে ইউরোপীয় যুদ্ধগুলি কর্ণাটে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষকে প্রভাবিত করে? তোমার কি মনে হয় যে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে সংঘর্ষ দেখা দেয়?

১৫.২ গ্রন্থপঞ্জী

১. পলাশীর ষড়যন্ত্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—রজত রায়

2. Thomson and Garrat–Rise and Fulfilment of British Empire in India.

3. H.V. Bayley– Indian Society and the Making of British Empire.

4. H.V. Borsen– Revenue and Reform : The Indian Problems in British Politics. (1757-1813)
5. K.N. Chaudhury–The Trading World of Asia and the British East India Company (1600-1760)
6. Philip Lawson – The East India Company.
7. P.J. Marshall– Bengal : The British Eastern India (1740-1823)
8. P.J. Marshall (ed) : The New Cambridge History of India Vol.-II.